নমঃ সচ্চিদানন্দায় হরয়ে।

সাধু অঘোরনাথের

জীবন চরিত।

"ন তপাংসি ন তীর্থানি ন শাস্ত্রাণি জয়ন্তি বঃ।
সংসারসাগরোত্তারে সজ্জনাসেবনং বিনা।"
[যোগবাশিষ্ঠ।]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক রচিত।

স্বর্গগত সাধুর পরিবারের উপকারার্থ এই গ্রন্থ
পুনর্মুদ্রিত হইল।

কলিকাতা।

২১০/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৭ মাঘ।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

ভূমিকা

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিলাস সভ্যতার মধ্যে ভাই অঘোর নাথের সাধুজীবন একটি অমূল্য স্বর্গীয় পদার্থ সন্দেহ নাই। বিচিত্রকর্ম্মা বিধাতা পুরুষ ব্রাহ্মসমাজে নববিধানের রঙ্গভূমিতে এই যোগী যুবার জীবন প্রদর্শন করিয়া কলির জীবদিগকে বিশ্বাসী হইবার একটি সুন্দর সুযোগ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা অধ্যয়ন করিলে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়। পার্থিব দেহপিঞ্জর হইতে যোগবিহঙ্গ এখন নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, মৃত্যু জীবন আনিয়া দিয়াছে, অঘোর নাথ ভাগবতী তনুলাভ করিয়া স্বর্গধামে অমরদলে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার যোগজীবনের শীতল ছায়া ইহলোকবাসী সাধকদিগকে চিরদিন শান্তি এবং শীতলতা বিতরণ করিবে। সাধু অঘোর ইহপরলোকে অমরত্বের স্রোত প্রবাহিত করিয়া উভয় লোকে সত্যের সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। কেবল সাক্ষী কেন, নিজ জীবনের সাধুতা দ্বারা তিনি এক্ষণে আমাদিগের চরিত্র বিচার করিতেছেন। অসাধু অযোগী ব্যক্তিরা জীবদ্দশাতেই মৃতবৎ অবস্থিতি করে, সাধু মরিয়াও নবজীবনের আলোকে স্বর্গ এবং পৃথিবীকে সমুজ্জলিত করিয়া রাখেন। এই মহাত্মার জীবনচরিতে ভগবানের জীবন্ত লীলা প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং বর্ত্তমান সময়ের চতুর্দ্দিকের

ধর্ম্মহীন অবস্থার মধ্যে ইহাঁর সৌন্দর্য্য গুপ্তভাবে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদিগের চিত্তকে হরণ করিয়াছে। কল্পনা নহে, কবিত্ব-রস উদ্দীপক অত্যুক্তি নহে, কিন্তু একটি সারবান্ সাধুজীবন। ইহা সর্ব্বজন উপকারী, এবং ব্রাহ্মভ্রাতৃগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষণীয়। কালের আবরণ ভেদ করিয়া, ব্রাহ্মসমাজের বক্ষে সবলে আঘাত করিয়া, সাধু অঘোর নাথের অমরচরিত মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন ভবিষ্যদ্বংশের চিত্তাকাশে যোগ বৈরাগ্যের প্রভাব বিস্তার করিবে। মর্ত্ত্যজীবনের জড়-ভাব দৃষ্টিপথ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যোগিবরের আধ্যাত্মিক পবিত্র জীবন পৃথিবীতে কখন বিলুপ্ত হইবে না। আমরা পরলোকে বসিয়া এই যোগী সখার অমর জীবন আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

বাল্যকাল।

১৭৬৩ শকের ১৮ ই অগ্রহায়ণ তারিখে শান্তিপুর গ্রামে কোন এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যকুলে অঘোর নাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা যোগধর্ম্মপরায়ণ একটি সাত্ত্বিক হিন্দু ছিলেন। তিনি হিন্দু যোগশাস্ত্র অনুসারে ভজন সাধন করিতেন। শান্তি-পুরের লোকেরা তাঁহাকে যদিও বৈদ্য বলিয়া ডাকিত, প্রকৃত

নাম তাঁহার যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ। ইনি পার্সিতে কৃতবিদ্য হইয়া পরে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে শাস্ত্রবিচার উপস্থিত হইলে কবিভূষণকে মধ্যস্থপদে বরণ করা হইত। ইনি পৌত্তলিক ছিলেন না। কিন্তু প্রাতঃস্নান, যোগসাধন এবং অপরাপর কর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ়নিষ্ঠ ছিলেন। ব্যবসায়ী গুরুদিগকে মানিতেন না, বাড়ীতে গুরু আসিলে কোন সন্তান তাঁহার উচ্ছিষ্টান্ন না খায় তদ্বিষয়ে পরিবারকে সাবধান করিয়া দিতেন। নিকৃষ্ট জন্তুদিগের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট দয়া ছিল। এমন কি ক্ষিপ্ত কুক্কুরে দংশন করিলেও তাহাকে আঘাত করিতেন না। তিনি কুম্ভকযোগ সাধন করিয়াছিলেন। অঘোর নাথ সম্বন্ধে একবার আপনার পরিবারকে বলেন যে, অঘোরকে গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে দিও না। অঘোর আমার বড় লোক হইবে। তিনি যোগী গৃহস্থ ছিলেন, চিকিৎসা বিদ্যা ভালরূপ জানিতেন। আসন্ন মৃত্যু জানিলে রোগীর নিকট কখন অর্থ গ্রহণ করিতেন না, এবং রোগের লক্ষণ দেখিয়া মৃত্যুর সময় বুঝিতে পারিতেন। সাংসারিক অবস্থা তাঁহার তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মভাব উচ্চ ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে এক চোর সিঁদ কাটিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করে। সে ব্যক্তির পরিশ্রম যথেষ্ট হইল, অথচ কিছুই লাভ হইল না। শূন্যহস্তে ভগ্নমনে চোর ফিরিয়া যায় দেখিয়া বৈদ্যমহাশয় তামাক সাজিলেন

এবং চোরকে মৃদুভাবে বলিলেন, ওহে ভাই, এতক্ষণ পরিশ্রম করিলে কিছু পাইলে না, আহা! একবার তামাক খাইয়া যাও। চোর অপ্রতিভ এবং লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। ইহাঁর মাতা ঠাকুরাণী সহমরণে গিয়াছিলেন। ফলতঃ এ পরিবারটিকে একটি ধর্ম্মপরিবার বলিয়া বোধ হয়।

অঘোর নাথ যখন দ্বাদশবর্ষীয় বালক, তখন তিনি পিতৃ-হীন হন। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর মাতাকর্ত্তৃক ভ্রাতৃ-গণ সহ অতি দীনাবস্থায় প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যোগী পিতার ঔরসে জন্মিয়া ভাই অঘোর স্বীয় বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা ভাই ভগ্নীতে সাত আটটি। অঘোর নাথকে ভ্রাতারা সকলে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কোন ভাই ভগ্নীরই সহিত তাঁহার কখন ঝগড়া বিবাদ হয় নাই। পৈতৃক যোগধন অজ্ঞাত-সারে অঘোরের জীবনকে অধিকার করিয়াছিল। ইনি একটি নির্দ্দোষ শান্তস্বভাব বালক ছিলেন। প্রথম জীবনেই ইহাঁর প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। ইহাঁর পরোপকার প্রবৃত্তি বাল্যকালে প্রতিবাসীদিগের সেবাদ্বারা চরিতার্থ হইত। অঘোর নাথ গৃহকার্য্যে অনেক সহায়তা করিতেন। যখন বাজারে তরকারি ক্রয় করিতে যাইতেন, তখন প্রতিবাসীরা অনেক ফরমাইস করিত, এবং দ্রব্যাদি আনিবার জন্য তাঁহার করণ্ডিকামধ্যে পয়সা কড়ি ফেলিয়া দিত। অঘোর নাথ প্রফুল্লচিত্তে সেই

সকল সামগ্রী আনিয়া প্রতিজনকে দিতেন, কাহারো হিসাবে গোল হইত না। বাড়ীর লোকে এ বিষয়ে ভৎর্সনা করিলে তিনি হাসিতেন। তাঁহার এই পরোপকারের ভাব পর জীবনে উচ্চতর আকার ধারণ করে। এমন কি লোকের সেবা করিতে পারিলাম না এই ভাবিয়া তাঁহার মনে নিরতিশয় আত্মগ্লানি উপস্থিত হইত। বালক অঘোর খাওয়া পরার পারিপাট্য বিষয়ে স্বভাবতঃ উদাসীন ছিলেন, ভাল বস্ত্রাদি পাইলেও তাহা ব্যবহারে বীতরাগ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিরীহ ধীর প্রকৃতি বাল্যকালেই পিতা মাতার মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

পাঠ্যাবস্থা।

বাল্যকালে প্রথমে কিছু দিন পাঠশালায় এবং টোলে লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া সাধু অঘোর নাথ তদীয় চতুর্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন রায়ের সাহায্যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে জল তুলিয়া রাঁধিয়া খাইয়া কালীঘাটের বাসা হইতে এখানে যাতায়াত করিতেন। পাঠ্যাবস্থায় ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎসাহী কতিপয় তরুণবয়স্ক যুবার সহিত মিলিত হন। তাঁহাদিগের সঙ্গে কখন কখন কলি-

কাতার বাসায় থাকিয়া যোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজে গমনা-গমন করিতেন। কিছু দিন পরে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। প্রথম যৌবনেই ইহাঁর স্বভাবে ব্রহ্মানুরাগ এবং ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং ইংরাজি অধ্যয়ন করিতেন এবং ক্লাসে একটি ভাল ছেলে ছিলেন। তদবস্থায় কখন সমাজে কখন সহাধ্যায়ী যুবকদলের সহিত ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিতেন। অঘোর নাথের সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ, বলিয়াছেন, বিদ্যালয়ে আমাদের বন্ধু যখন পড়িতেন তখন হইতেই তিনি "বিনম্র, সরল, প্রেমিকহৃদয় ছিলেন। বয়স্যগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা মিটাইয়া দিতেন, কাহারো পীড়া হইলে সাধ্যানুসারে সেবা শুশ্রূষা করিতেন, সকলকেই ভাল বাসিতেন। কাহারো উন্নতি দেখিলে তাঁহার মনে হিংসা হইত না। পরিবারস্থ আত্মীয়গণের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ উজ্জ্বল ছিল। সকল বিষয়ে দৃঢ়নিষ্ঠা প্রকাশ পাইত।" ধর্ম্মের জন্য পরিবারস্থ গুরুজনেরা ভর্ৎসনা করিলেও কখন তিনি তাহার উত্তর করিতেন না। একদা তাঁহার মাতা অনুরোধ করিয়াছিলেন, অঘোর, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া যার তার ভাত খাইয়াছ, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে ইহা স্বীকার করিও না। তিনি ইহাতে বলেন যে, আমি মিথ্যা কথা কিরূপে বলিব। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে অকপট তীক্ষ্ণ বিবেকী হইলেও উদ্ধতস্বভাব যুবকের ন্যায় বৃথা

আঁড়ম্বর দেখাইয়া হিন্দু অভিভাবকগণের মনে কখন তিনি ক্লেশ দিতে চাহিতেন না। এই জন্য পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রীতিবন্ধন স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে তদীয় ভ্রাতৃগণ ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হন। ভাই অঘোব প্রথম হইতেই কষ্টেতে আনন্দানুভব করিতে শিখিয়াছিলেন। প্রচারব্রতে ব্রতী হওয়া তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগের প্রধান কারণ। এই সময় তিনি কলিকাতায় কোন বন্ধুব সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। প্রাইভেট টুইশনের দ্বারা তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। যে পরিবারে ছিলেন তাঁহারা অঘোর নাথকে অতিশয় স্নেহ এবং শ্রদ্ধা করিতেন। নিতান্ত দুঃখেব অবস্থায় থাকিলে সচরাচর লোকের মনে সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি বেশী প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু ভাই অঘোর সে ভাব কখনও মনে স্থান দেন নাই। বন্ধুর সহিত কোন দিন হয়তো কেবল লেবুব রস দিয়া এক পাত্রে অন্ন ভোজন করিতেন। তবল্‌দারেরা যেমন কাঠ কাটে সেইভাবে দুইজনে একপাতে আহার করিয়া হাসিতেন এবং আমোদ করিতেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া দেন এবং ঈশ্বরসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন।

ধর্ম্মানুরাগ।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে অঘোর নাথের ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, সাধুসঙ্গলাভে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল। তদনন্তর কলিকাতা সমাজের ব্রহ্মোপাসক যুবাদলের মধ্যে ইনি একজন পরিচিত সভ্য হইলেন। ক্রমে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার অন্যান্য ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গেও আলাপ হইল। যে ব্রাহ্মসঙ্গত সভা তৎকালে যুবক ব্রাহ্মগণকে ব্রাহ্মধর্ম্মপালনে উৎসাহী করে, এবং যাহার সভ্যগণ ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমি বলিয়া এখন পরিগণিত হইয়াছেন, সেই সভার সভ্যগণের মধ্যে যোগী অঘোর নাথ একজন সুলক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্মপিপাসু সভ্য ছিলেন। ইনি ধর্ম্ম আলোচনা কিংবা তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না, যথাসাধ্য প্রাণগত যত্নে নিজ জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতেন। বাহিরের বহু প্রকার প্রতিকূল অবস্থা সকল পরাস্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার পদ চুম্বন করিয়াছিল। সঙ্গতসভায় যে সকল সুনিয়ম নির্দ্ধারিত হইত তাহা তিনি অকপটে যাজন করিতেন। এইরূপ করিতে করিতে ধর্ম্মপ্রচারের ভাব মনে আরো জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিদ্যালয়ে অধিককাল রীতিমত জ্ঞানশিক্ষা করিতে পারেন নাই। অলঙ্কার শাস্ত্রের অশ্লীল বর্ণনা

তাঁহাকে বিদ্যাভ্যাসে বিরত করে। কিন্তু যাহা কিছু তিনি শিখিয়াছিলেন তাহা প্রথম হইতে ধর্ম্মকার্য্যে উৎসর্গ করিলেন। সুতরাং দৈববলে একগুণ বিদ্যা বুদ্ধি দশগুণ হইল। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে প্রচারকার্য্যে ব্রতী থাকেন। "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন এবং গৃহে বসিয়া তত্ত্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। এই সময় "প্রত্যাদেশ অন্তরে" বলিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালা রচনা তাঁহার অতি মিষ্ট এবং বিশুদ্ধ। ধর্ম্মসম্বন্ধে তখন যেখানে যে সভা হইত সেই খানে উৎসাহের সহিত গিয়া যোগ দিতেন। নিরীহ শান্তভাব ইঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। যৌবন কালেই যোগের গাম্ভীর্য্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, উদ্যমশীলতার উজ্জ্বল চিহ্নসকল প্রকাশ পাইত। দেখিতে নিতান্ত ভাল মানুষ, শান্তপ্রকৃতি ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপালনে কখন ভীরুতা প্রদর্শন করেন নাই। তৎকালে আনুষ্ঠানিক অপৌত্তলিক ব্রাহ্মের সংখ্যা অতি কম থাকিলেও, মেষপ্রকৃতি অঘোর নাথ তাহার ভিতরকার একজন প্রধান ছিলেন। বিধবাবিবাহ সঙ্কর বিবাহ প্রভৃতি দেশাচারবিরুদ্ধ সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি অকপটে যোগদান করিতেন। যদিও তরুণবয়স্ক যুবা, কিন্তু ধর্ম্মোৎসাহে সিংহ শাবকের ন্যায় নির্ভয়চিত্ত। যোড়াসাঁকো ব্রাহ্মসমাজ হইতে উন্নতিশীলতার অপরাধে যে সকল যুবক সভ্য কেশবচন্দ্রের

সহিত তাড়িত হন তন্মধ্যে অঘোরনাথও একজন ছিলেন। সে সময় কলুটোলা ইহাঁদের গতি বিধির স্থান ছিল। এখান হইতে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে যে সকল অভিনব মত ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা সমগ্র ভাবে জীবনে পরিণত করিবার জন্য সাধু অঘোর সর্ব্বদা ব্যগ্র থাকিতেন। এই স্থানে তাঁহার ভিতরে যে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিয়াছিল তাহা এক দিনের জন্য নির্ব্বাণ বা ম্লান হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর সমুজ্জ্বলিত হইয়া নিরুৎসাহীকে চির দিন সঞ্জীবিত করিয়াছে।

ধর্ম্ম প্রচার।

অনুমান ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৭৮৬ শকের মধ্য ভাগে সাধু অঘোর নাথ ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন এবং প্রায় বৎসরাধিক কাল তথায় ছাত্রদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন। এই তাঁহার প্রথম এবং শেষ চাকরী; অথবা ইহা ধর্ম্মপ্রচারের নামান্তর মাত্র। চাকরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন বলিয়া এ কাজে তিনি ব্রতী হন নাই, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। তখন ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রায় কেহই উন্নতিশীল ব্রাহ্ম ছিলেন না, এই জন্য অঘোর নাথ তথায় আহূত হইয়া ব্রহ্ম-

বিদ্যালয় এবং সমাজের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। প্রচারক নাম রীতিপূর্ব্বক তৎকালে তিনি গ্রহণ করুন বা না করুন, কিন্তু কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে প্রচারক ছিলেন। এক বৎসর কাল এই স্থানে থাকিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ব্রাহ্মদলের মধ্যে সুদৃষ্টান্ত এবং সৎশিক্ষা দ্বারা যে মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহার ফল এখন পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ভোগ করিতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে ধর্ম্মনীতি শিখাইতেন, বাসায় বাসায় গিয়া লোকের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ও উপাসনা করিতেন, সামাজিক উপাসনায় উপাচার্য্যের কার্য্য করিতেন, উৎসাহী যুবকদিগকে লইয়া সঙ্গত সভা করিতেন, কখন নির্জ্জনে গিয়া ধ্যান চিন্তনে মগ্ন থাকিতেন। এই সকল উপায়ে অল্পকাল মধ্যে তথায় কয়েকটি ব্রাহ্ম যুবা দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন, এবং দৈনিক উপাসনাদি আরম্ভ করেন। তত্রত্য বর্ত্তমান ভক্তদল তাঁহার বিশ্বাসের প্রবল প্রভাব এবং গভীর আধ্যাত্মিক ভাবদর্শনে বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিলেন। তদবস্থায় সাধু অঘোর নগর পরিত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে মফস্বলে গিয়াও ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব, উপাসনা, প্রার্থনা, জীবন্ত উৎসাহস্রোত এই সময় হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে উন্মুক্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। সে দেশের প্রাচীন ও যুবক ব্রাহ্মগণ অঘোর নাথের সাধুতা বিষয়ে কেহই প্রায় ভিন্নমত নহেন।

ঢাকা নগরই তাঁহার প্রথম প্রচারক্ষেত্র হইয়াছিল এবং সেখানে তিনি বিলক্ষণ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। কেন না আমরা দেখিতে পাই, দৈনিক উপাসনা এবং সমাজ-সংস্কারের কার্য্য এই সময় হইতে তত্রত্য ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। অঘোরনাথের নিরামিষ ভোজন, শুদ্ধাচার, গাম্ভীর্য্য, সত্যপ্রিয়তা, উপাসনানুরাগ দর্শনে তাঁহাকে অনেকে গোঁড়া ব্রাহ্ম বলিত বটে, কিন্তু সে গোঁড়ামী তাঁহার সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক ছিল।

এক বৎসর ঢাকা নগরে অবস্থান করিয়া ভাই অঘোর কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং ১৭৮৭ শকাব্দের শেষ ভাগে দার পরিগ্রহ করেন। বিবাহসম্বন্ধে তাঁহার বড় উচ্চ এবং বিশুদ্ধ ভাব ছিল। তিনি বলিতেন, আমি আধ্যাত্মিক বিবাহ করিব। বাস্তবিক তিনি ধর্ম্ম অনুরোধেই কায়স্থ-বংশীয় কোন এক পরিচিত বন্ধুর বিধবা ভগ্নীর পাণিগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় সঙ্কর বিবাহ। আশ্রয়হীন, অন্নহীন, সমাজপরিত্যক্ত ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া দারপরিগ্রহ করিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য ধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। গৃহস্থ বৈরাগী হইয়া সংসারে যোগ সাধন করিবেন বলিয়াই গার্হস্থ্য ধর্ম্মে ব্রতী হইলেন। যখন তিনি বিবাহের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব ব্যক্ত করিতেন তখন আমি তাঁহার অভিপ্রায় ভাল-রূপে বুঝিতে পারিতাম না। সময়ে সময়ে প্রচারক্ষেত্রে

আমি তাঁহার সঙ্গী ছিলাম, এজন্য নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথাও কিছু কিছু বলিব। এক জন বাইশ তেইশ বৎসরের যুবা বলে যে আধ্যাত্মিক বিবাহ করিব; ইহা শুনিয়া আমার মনে এক আশ্চর্য্য ভাব উদয় হইত। সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী যুবা হইয়াও ভাই অঘোর যখন বিবাহ করিলেন আমার স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে, তখন আমি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, বন্ধো, এখন আরতো ফকিরী বেশে থাকিলে চলিবে না, ঘরকন্নার সকল সামগ্রীই চাই। ইহার উত্তর তিনি যেরূপ গম্ভীর ভাবে লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমার আমোদ রহস্য লজ্জা পাইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার বিবাহের ভিতরেও কিছু অসাধারণতা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বিবাহের পর প্রায় বৎসরাবধি সহধর্ম্মিণী হইতে তিনি পৃথক্ ছিলেন; কেবল মাঝে মাঝে তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইতে যাইতেন এই মাত্র।

পৌষ মাসে বিবাহ করিয়া ফাল্গুন মাসে অঘোরনাথ ধর্ম্মপ্রচারার্থ বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলে গমন করেন। ইং ১৮৬৬ সালের প্রথম হইতে তাঁহার প্রচার-কার্য্য সাধারণ ভাবে আরম্ভ হয়। তখন পদব্রজেই সমস্ত নগর গ্রাম পল্লী ভ্রমণ করিতে হইত। মফস্বলস্থ অনেকানেক নগর উপনগরে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি প্রথমে প্রজ্বলিত করেন, এবং স্থানে স্থানে ধর্ম্মপিপাসু যুবাদিগকে উপাসনা এবং ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন; প্রাচীনভাবেশিক্ষিত ব্রাহ্মগণকে

নব ভাব দান করেন, ধর্ম্মহীন জিজ্ঞাসুদিগকে ধর্ম্মপথে সত্যের পথে আনেন। যে সময় প্রচারার্থ রংপুর নগরে উপস্থিত হন সেই কালে শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ তথায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি অঘোরনাথের গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, জীবন্ত ধর্ম্মোৎসাহ দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারি উপলক্ষে প্রচারক পরিবারে ভুক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ যোগী অঘোরের বাহ্য আকৃতিতেও এমন এক প্রকার বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক সাত্ত্বিক ভাব ছিল যাহা দর্শন মাত্র লোকের মনে সাধুভাব উদ্দীপিত হইত। ইহাঁর প্রচারক্ষেত্রে অতি আশ্চর্য্য ঘটনা ও বিপদ পরীক্ষার কথা আমরা শুনিয়াছি; এবং এই সময়ের জীবন আমাদের নিকট বিশেষ মূল্যবান্।

রংপুর অঞ্চল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভাই অঘোরনাথ "শ্লোক সংগ্রহ" নামক গ্রন্থ সঙ্কলনে সহায় হন। "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ" সংস্থাপনের সময় এই পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। বেদ উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থের অন্তর্গত ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রতিপাদক শ্লোক সকল এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৭৮৮ শকে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তদ্দ্বারা ধর্ম্মের উদার এবং সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। সেই ভাবে প্রমত্ত হইয়া আমাদের বন্ধু প্রচারার্থ পুনরায় পূর্ব্ববাঙ্গালা প্রদেশে যাত্রা করেন। প্রথমে সপরিবারে বরিষাল নগরে উপস্থিত হন। তথায় পরিবার রাখিয়া নওয়াখালী, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা,

প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। কুমিল্লা হইতে শ্রীহট্ট ও কাচার অঞ্চলে যাইবার সময় আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। তৎকালে প্রিয়বন্ধু অঘোরনাথের ধর্ম্মোৎসাহ ব্রহ্মনিষ্ঠা স্বচক্ষে যাহা আমি দেখিয়াছি তাহা এখন যতই মনে হইতেছে ততই তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। তখন সঙ্গে ছিলাম, তাহার পরেও বহু দিন পর্য্যন্ত একত্র অবস্থান করিয়াছি, কিন্তু এখন আমি তাঁহার জীবনের ছবি চিত্রিত করিবার জন্য যতই তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিতেছি, ততই অধিকতর সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা ইহার ভিতরে দেখিতে পাইতেছি। সমস্ত ঘটনারাজী যেন একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া মনে হইতেছে।

কুমিল্লা নগর হইতে মাঘ মাসের প্রথমে আমরা শ্রীহট্টাভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করি। যে বেশে যে ভাবে আমরা পথে চলিতাম, পান্থশালা কি গৃহস্থের ভবনে রজনী যাপন করিতাম, তাহার বিস্তারিত ঘটনাপুঞ্জ মনে হইলে মনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য রসের আবির্ভাব হয়। অঘোরনাথের ধর্ম্মজীবন, বৈরাগ্যপ্রতিভা যে আমাকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া দেশে দেশে লইয়া গিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। ব্যাগ হস্তে লইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে বৈরাগ্যবিরুদ্ধ মনে হইত, এই জন্য তিনি পিঠ্‌বোঁচকা পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া পথে চলিতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা

পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রায় দশ ক্রোশ করিয়া পথ আমরা হাঁটিতাম। মধ্যাহ্নরবিতাপে অঘোরনাথের মুখমণ্ডল তাম্র বর্ণ হইয়াছে, গাত্রে ঘর্ম্ম ছুটিতেছে, অথচ তিনি দুস্তর প্রান্তর, অলঙ্ঘ্য গিরি পর্ব্বত নদ নদী কানন অতিক্রম করিয়া দ্রুতপদে অবিশ্রান্ত বেগে চলিতেছেন। উদরে অন্ন নাই, মস্তকে আতপত্র নাই, চরণে ছিন্ন পাদুকা, পরিধেয় মলিন বসন হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, পৃষ্ঠদেশে বস্ত্রের গাঁঠরি ঝুলিতেছে, সেই অবস্থায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পথে চলিতেছেন। কিন্তু কোথায় যাইতেছেন? এমন যৌবন কালে সংসারের সুখবিলাস লজ্জা সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া এত কষ্ট কিসের জন্য? দুর্নিবার অন্নচিন্তায় অধীর হইয়া কি দেশে দেশে এইরূপে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন? না, তাহা নহে। অথচ বেতনভুক্ বিষয়ীর বিষয়কর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার এ কার্য্যে অধিক অনুরাগ। কাহারো অধীন নহেন, এক কপর্দ্দক কাহারো নিকট প্রত্যাশাও করেন না, অথচ দাস্ত কার্য্যে একান্ত নিরলস। তবে কিসের নিমিত্তে এত আগ্রহ ব্যাকুলতা? এই জন্য যে, ভারতের সীমা হইতে সীমান্তরবাসী নর নারীদিগকে স্বর্গের শুভ সমাচার শুনাইয়া, ব্রহ্মউপসনার অমৃত বিলাইয়া তাহাদিগকে সুখী করিবেন, জগতে সত্যের জয় ঘোষণা করিবেন। সংসারের চতুর্দ্দিকের লোকদিগের অবস্থার সঙ্গে যখন আমি ইহা মিলাইয়া দেখি, তখন পৃথিবীতে স্বর্গীয় শোভা দেখিতে পাই।

পথে স্থানে স্থানে লোকেরা আমাদিগকে দেখিয়া বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তাহাদিগকে সহজে বুঝাইতে পারিতাম না। প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া নামক উপবিভাগে আমরা কয়েক দিন অবস্থিতি করি, পরে শ্রীহট্ট হইয়া, কাচারের দিকে চলিয়া যাই। এক দিন মধ্যাহ্নকালে এক ক্ষুদ্র পান্থশালায় উপনীত হওয়া গেল। মুদির দোকানে চিড়া ভিজাইয়া আহারে বসিব এমন সময় বিকট দর্শনা যমকিঙ্করীর ন্যায় এক গণিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং অভিমান ও রাগভরে তাহার রক্ষকের সহিত বিবাদ করিতে লাগিল। যে স্থানে আমরা ভোজন করিতে বসিয়াছি তাহার উপরিভাগে সেই হতভাগিনীর দুর্গন্ধময় মলিন কন্থারাশি এবং অপবিত্র শয্যাদি স্থাপিত ছিল। গণিকা ক্রোধভরে তাহা ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, সুতরাং আমাদিগের মস্তকের ও খাদ্যের উপর ধূলি, মাটী, জঞ্জাল পতিত হইয়া আহারের সমূহ ব্যাঘাত করিল। ঐ সকল পান্থশালায় যে সকল মুদির দোকান থাকে তাহার পার্শ্বেই গণিকা বাস করে। আমরা রৌদ্রে পুড়িয়া পথ হাঁটিয়া কিরূপ সুখে পান ভোজন করিলাম, পাঠকগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বন্ধু অঘোর নাথ তাদৃশ ক্লেশকর অবস্থাতেও বিন্দু মাত্র নিরুৎসাহী নহেন, প্রতি দিন দশ ক্রোশ পথ ভ্রমণ, দিবসে চিড়া, রজনীতে রন্ধনপূর্ব্বক ভোজন, কোন দিন দোকানে কোন দিন গৃহস্থভবনে রাত্রি

স্থাপন, এইরূপে ঐ সকল দেশে গিয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন। আমাদের বাহ্য আকার দর্শনে কেহ মনে করিত আমরা তিসির ব্যাপারী, কেহ যবন খানসামা, কেহ অন্য কিছু। শ্রীহট্ট হইতে কাচার যাইবার কালে আমাদিগকে নৌকাযোগে যাইতে কেহ কেহ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অঘোরনাথ তাহাতে সম্মত হইলেন না; দীন বেশে পদব্রজে দেশে দেশে বেড়াইবেন, আর লোকদিগকে, ধর্ম্ম শিক্ষা দিবেন এই তাঁহার সেবারকার সঙ্কল্প ছিল। নদীপার হইবার সময় এক স্থানে তিনি পড়িয়া আছাড় খাইলেন, শরীর ধূলি কর্দ্দমে আকুলিত হইল; আমি মনে করিলাম হাঁটিয়া যাওয়ার যদি এত কষ্ট, তবে কেনই বা নৌকাপথে যাইতে চাহেন না? কিন্তু তিনি অম্লান বদনে পুনর্ব্বার চলিতে লাগিলেন। সেই দিন মধ্যাহ্নকালে পথে কোথাও আর মুদির দোকান মিলিল না, ক্ষুধা তৃষ্ণায় শরীর শ্রান্ত হইল, নিকটে একটী মস্‌জিদ্ দেখিয়া আমরা তথায় প্রবেশ করিলাম। তৎসন্নিহিত এক যবনগৃহে আমাদের জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন ব্যঞ্জনের সংস্থান হইল। পলাণ্ডুগন্ধযুক্ত কিছু জলীয় পদার্থ আর অন্ন আমরা পাইলাম। আমার তাহাতে রুচি হইল না, অতি কষ্টে অল্পমাত্র গলাধঃকরণ করিলাম, কিন্তু বন্ধু আমার তাহাই অমৃততুল্য জ্ঞান করিয়া আহার করিলেন। "যদৃচ্ছয়োপপন্নামদ্যাৎ শ্রেষ্ঠ-মুতাপরম্। তথা বাসং তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজে-

মুনিঃ॥" এই ভাগবতীয় মহাবাক্য তাঁহাতে প্রমাণিত হইল। জাতির প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহস্বামিনী ভোজ্যপাত্র ধৌত করিবার জন্য আমাদিগকে বাধ্য করিলেন; অগত্যা তাহাও করিতে হইল; আমি কিছু অপ্রসন্নতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিলাম। আর এক দিন পথ চলিতে চলিতে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, হাটে থাকিবার ঘর পাইলাম না, পল্লী মধ্যে এক যবনগৃহে অতিথি হওয়া গেল। নিরামিষ ভোজী ধর্ম্মপ্রচারক আহারার্থ যবনগৃহে আমিষ ব্যঞ্জন ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করিতে পারেন? আমাদের বন্ধু জীবন ধারণের অনুরোধে মৎস্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার ঝোল দিয়া কিছু অন্ন আহার করিলেন। আমরা কলিকাতার কোন সাহেববাড়ীর বাবুর্চি কি খানসামার উচ্চ পদে চাকরী করি এই সংস্কারে বোধ হয় গৃহস্থেরা আমাদিগকে খাতির করিয়াছিল। অথবা মুসলমানদিগের আতিথেয়তা একটি প্রধান ধর্ম্ম। পর দিন প্রাতে তাহারা ইদ্ করিয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করে, আমরা তাহাতে সম্মত হইলাম না, পরে পথে আসিয়া উভয়ে সে কথার আমোদ সম্ভোগ করিলাম! জাতিভেদ মানি না, ইহা শুনিয়া কত স্থানে বিড়ম্বিত হইতে হইত। ঈদৃশ স্থলে নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধ না হইলে কে আর আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বিপদকে ডাকিয়া আনিবে? এই জন্য আপনা হইতে আমরা সব জায়গায় জাতির পরিচয় বড় দিতাম না, কিন্তু

চেহারা দেখিলে যবনেরা স্বজাতি ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারিত না। আমরা যে কি, তাহা বুঝাইবারও কোন উপায় ছিল না।

এইরূপ ক্লেশ কষ্টে পথ অতিক্রম করিয়া তিনি সে বৎসর ঐ সকল দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিলেন। নগরে উপস্থিত হইয়াও আহার ও বাসস্থান সম্বন্ধে অনেক অসুবিধা ঘটিত। শ্রীহট্টে যে দিন পৌঁছান গেল. সে রাত্রি এক ভদ্রলোকের গৃহে আশ্রয় এবং ভোজন পাই-লাম, কিন্তু পর দিন তিনি স্থান দিতে সাহস করিলেন না; শেষ এক স্বতন্ত্র স্থানে সকল বন্দোবস্ত হইল, এক জন কুলী আমাদের রন্ধনাদি করিত। ধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য নাগরিকেরা অনেকে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেন। একটি যুবা কিছু অধিক অনুরাগ প্রকাশ করায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা প্রচারকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন; কিন্তু শান্তচিত্ত অঘোরনাথ তাঁহাকে বিনম্র বচনে সন্তুষ্ট করিয়া দিলেন। পরে কাচারে কয়েক দিন থাকিয়া তিনি ছাতক ও চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে যান। একদিকে পথের সেই দৈন্যাবস্থা. অপর দিকে আবার ভদ্রলোকের গৃহে আদর যত্নও যথেষ্ট পাওয়া যাইত। কোন ব্রাহ্ম পাথেয় কিছু টাকা দিতে চাহিলে সাধু অঘোর তাহা লইলেন না। পাহাড়ে তাঁহাকে আমি ব্রহ্মধ্যানে যেরূপ অনুরাগী পিপাসু দেখি-য়াছি তাঁহা অনুকরণীয়। প্রায় সমস্ত দিন হাঁটিয়া পর্ব্বতের

উপর আমরা উঠিলাম, দিবসে আহার জুটিল না। রাত্রি-বাসের পর পুনরায় নামিয়া আসিলাম। উঠিবার এবং নামিবার সময় পর্ব্বতশৈলে বসিয়া তিনি ধ্যানে মগ্ন হই-তেন। "ইয়ারকো হামে জা বজা দেখা" এই হিন্দি গান তথায় আমার মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি বড় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পথে চলিতে চলিতে নদীতটে, বৃক্ষতলে বা প্রান্তরে পর্ব্বতে বসিয়া যখন দুইজনে বাইবেল কিম্বা অন্য কোন ধর্ম্ম পুস্তক পড়িয়া আমরা আলোচনা করিতাম, তখন শ্রান্তি চলিয়া যাইত। আহা, কি আনন্দের সেই অবস্থা! ক্লেশ অনাহার অনিদ্রা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ ছিল। এ যাত্রায় তিনি ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশালে ধর্ম্ম প্রচার করেন।

অনন্তর ভাই অঘোর কিছু দিন কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এ সময় প্রচারকদলের ভরণ পোষণের জন্য রীতিমত কোন উপায় ছিল না। একাহার, অর্দ্ধাশন, বস্ত্রাভাব, ঔষধ এবং গৃহাভাব প্রভৃতি যে সকল কষ্ট যন্ত্রণায় প্রচারকগণ নিপীড়িত হন তাহার এক প্রধান অংশের ভাগী ইনি ছিলেন। শারীরিক নিয়মভঙ্গজনিত ক্লেশে অম্লরোগ জন্মিয়াছিল, তথাপি এক দিনের জন্য প্রভুর সেবাসাধনে তিনি শিথিলযত্ন হন নাই। এই সময় বর্ত্তমান ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রচারিত হয়। এই প্রণালী অনুসারে কলুটোলায় আচার্য্যভবনে প্রত্যহ একত্র উপাসনা হইত। মৃদঙ্গ কর-তাল, ভক্তিরসের কীর্ত্তন, ব্রহ্মোৎসব এই সময়ের ফল।

প্রণালীপূর্ব্বক উপাসনা সঙ্কীর্ত্তনাদিতে অঘোরজীবন বিশে-ষরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বস্তু ভোজনে যেরূপ ব্যাকুল হয়, উপাসনা ধ্যানে অঘোরনাথ তেমনি ছিলেন।

১১ ই মাঘের প্রথম উৎসবে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইল, ভক্তিরসপূর্ণ উপাসনার নবভাব লইয়া অটল উৎ-সাহী অঘোরনাথ প্রচারার্থ পুনরায় মালদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরির বাসায় থাকিয়া তথায় বক্তৃতাদি করেন। ইহাঁর যোগানুরাগ কত দূর প্রবল ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত এখানে প্রকাশ আছে। ডাক্তার কাস্তগিরির মুখে আমরা শুনি-য়াছি, ভ্রাতা অঘোর নাথ এক দিন বলিলেন, আমার উপাসনায় তৃপ্তিবোধ হইতেছে না। এই বলিয়া তাহার পর দিন প্রাতে কোন এক সুরম্য আম্রকাননে প্রবেশ করিলেন। তথায় উপাসনা ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে মন এমনি মগ্ন হইল যে তিনি রাত্রিতে আর বাসায় ফিরি-লেন না। তদবস্থায় রাখাল বালকেরা তাঁহার অঙ্গে মৃত্তি-কাদি নিঃক্ষেপ করিয়াছে, উত্তরীয় বসন এবং পাদুকা লইয়া পলাইয়াছে, কিন্তু তথাপি যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। সমস্ত দিন গেল, রাত্রি গেল, পর দিন দশটার সময় একবস্ত্র হইয়া বাসায় আসিলেন! ডাক্তার বলিলেন আপনার পাদুকা এবং গাত্রাবরণ কোথায় গেল? অঙ্গধূলিধূসরিত,

ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করাতে অঘোরনাথ হাসিয়া কহিলেন, যাউক, সে জন্য কোন দুঃখ নাই, ইহার পরিবর্ত্তে আমি যথেষ্ট লাভ করিয়াছি। তাঁহার প্রসন্নতা দর্শনে ডাক্তার মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

এই যাত্রায় তিনি মালদহ হইতে পূর্ণিয়ার অভিমুখে গমন করেন। যে ভাবে তিনি প্রচার যাত্রায় বাহির হই-তেন তাহা দেখিলে মনে হয়, ভারতের প্রত্যেক নগরে ব্রহ্মনাম প্রচার করা যেন তাঁহার এক মহৎ সঙ্কল্প ছিল। যখন কোন স্থানে যাইবেন বলিয়া বাহির হই-তেন তখন দুর্গম অরণ্য, দুর্ভেদ্য গিরিমালা, সুদুস্তর স্রোতঃস্বতী, বিস্তীর্ণ প্রান্তর সকল অতিক্রম করিয়া সবেগে ধাবিত হইতেন। বৈতনিক কর্ম্মচারী ছুটীর পর কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইবার জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে ইহাঁর তদ্রূপ ব্যাকুলতা দৃষ্ট হইত। মালদহ হইতে পূর্ণিয়া যাই-বার পথ অতি দুর্গম অরণ্যময়, স্থানে স্থানে শ্বাপদ পশু এবং নরঘাতী দস্যুদিগের ভয় আছে। সেই পথে একাকী যাইতে যাইতে এক দিন সন্ধ্যাকালে এক মুসলমান পল্লীতে গিয়া তিনি উপনীত হন। কোন এক গৃহস্থভবনে বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে গোপনে ইশারা করিয়া বলিল, তুমি কোথায় আসিয়াছ, শীঘ্র পলায়ন কর। তিনি ভয়ে ভীত হইয়া বলিলেন, কোথায় যাইব? স্ত্রীলোক বলিল, তুমি রাস্তা দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া যাও।

এই কথা শুনিবামাত্র আমাদের বন্ধু ভয়ে ত্রস্ত হইয়া তৎ-ক্ষণাৎ বাহির হইলেন। সমস্ত দিবসের পথশ্রান্তির পর কোথায় একটু বিশ্রাম করিবেন, না আবার এই ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। কোথায় লুকাইবেন? সকলেই দস্যু, বিদেশ অপরিচিত স্থান, তাহাতে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারি দিক্ আচ্ছন্ন। কি করিবেন, প্রাণভয়ে পলাইতে হইল। দৈববশে একস্থানে নেকৃমর্দ্দনের মেলা হইতে প্রত্যাগত কতকগুলি যাত্রী দেখিতে পাইলেন। তাহাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে দিন তিনি রাত্রি যাপন করেন। দস্যুদল বোধ হয় তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়াছিল, কিন্তু কৃত-কার্য্য হইতে পারে নাই। এইরূপে বিধাতার কৃপায় সে যাত্রা অঘোরনাথ রক্ষা পান। পূর্ণিয়া নগরে আর যাওয়া ঘটিল না, উক্ত যাত্রীদিগের সঙ্গে পুনরায় মালদহে ফিরিয়া আসেন এবং রাজমহল হইয়া ত্রিহুত অঞ্চলে চলিয়া যান। পরে গয়া প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন।

এই বৎসর মুঙ্গের নগরে ধর্ম্মের বিশেষ আন্দোলন হয়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করেন। তাঁহার সমাগমে অনেক নূতন লোক, এবং পুরাতন ব্রাহ্ম-গণের মন হরিভক্তিরসে প্লাবিত হইয়াছিল। সঙ্কীর্ত্তন, মহোৎসব, সৎপ্রসঙ্গ, উপাসনাবিষয়ে অনেকের উৎসাহ বৃদ্ধি হইলে তাঁহাদিগকে লইয়া অঘোরনাথ কিছু দিন তথায় সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। তৎকালে

মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের ভক্তির উন্নতি, সাধনানুরাগ তাঁহাকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সিমলা পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন, অঘোরনাথ স্বীয় যোগ বৈরাগ্য ভক্তি মত্ততার দৃষ্টান্তে ভক্তমণ্ডলীকে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন। তিনি কখন পীর পাহাড়ে, কখন কাহারো বাড়ীতে সবান্ধবে ধ্যান ধারণা নাম সঙ্কীর্ত্তনে যাবৎ রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। সে সময় তাঁহার জীবনে সিংহের ন্যায় তেজ প্রকাশিত হইয়াছিল। কোন প্রকার ভক্তিবিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে তিনি মিশিতেন না, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে ধর্ম্মস্রোতে সন্তরণ করিতেন। ব্রাহ্মসমাজে নরপূজা অভিযোগ আরোপিত হইবার সময় তাঁহার চিত্তকে কেহ বিচলিত করিতে পারে নাই। ধর্ম্মনেতা কেশব চন্দ্রের চির অনুগত বিশ্বাসী শিষ্য হইয়া তিনি সমভাবে বিরোধী-দিগের অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মদিগকে লইয়া সজনে নির্জ্জনে ধ্যান চিন্তা উপাসনায় মগ্ন থাকা, সাধন-তত্ত্ব এবং চরিত্রের নিগূঢ় ভাব আলোচনা করা, যোগের পথ বলিয়া দেওয়া, তাঁহার বিশেষ কার্য্য ছিল। সর্ব্বত্রই এইরূপ শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেন। জীবনে স্থায়ী ফল এবং আধ্যাত্মিক গভীরতা যাহাতে জন্মে এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া তিনি বিবিধ উপায়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। গভীর আধ্যা-ত্মিকতা, যোগ, ধ্যানানুরাগ, তপোনিষ্ঠার প্রাধান্য আমরা তাঁহার জীবনে বহু দিন হইতে দেখিয়া আসিতেছি। মুঙ্গেরে

অবস্থান কালে তিনি ভক্তগণসহ প্রায় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মার্থ উপবাস এবং রাত্রিজাগরণ করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত উপাসনা ধ্যান কীর্ত্তন, তার পর কোন বৃক্ষতল কিংবা গিরিচূড়ায় নির্জ্জন চিন্তা, তদনন্তর অপরাহ্নে আহার এরূপ প্রায়ই ঘটিত। নিদাঘের মধ্যাহ্ন তাপে বিনা ছত্রে, কখন শূন্যপদে বাসায় বাসায় ঘুরিতেন। ব্রহ্মে বিলয়, দর্শন, সম্ভোগ, ব্রহ্মসহবাস, প্রেম রসপান, এই বিষয়ে সচরাচর প্রার্থনা করিতেন। প্রার্থনা-সকল তাঁহার আত্মার গভীর স্থান হইতে উত্থিত হইত। সে সময়ে তিনি সর্ব্বদা ভক্তিরসে মত্ত থাকিতেন।

মুঙ্গেরে থাকার পর হইতে ভাই অঘোর ক্রমে উত্তর পশ্চিম এবং পাঞ্জাব প্রদেশে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এত দিন প্রায় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ লইয়া ছিলেন, এক্ষণে ভারতের পশ্চিম সীমায় যাইতে লাগিলেন। প্রথম বার যখন লাহোর অমৃতসর মূলতানে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার আধ্যাত্মিক যোগ বৈরাগ্যের ভাব দেখিয়া পাঞ্জাবী ব্রাহ্মবন্ধুগণ অতীব আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। ভাই কেদারনাথ দে তৎকালে লাহোর নগরে বিষয়কর্ম্ম করিতেন। তিনি অঘোর নাথের সঙ্গে মিশিয়া উৎসাহিত হইলেন, চাকরী পরিত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে দেরাদুন প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া মৈশুরি পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। প্রচারকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু তখন সময়

পূর্ণ হয় নাই, কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার চাকরীতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় অঘোরনাথ পর্ব্বতে যে কয় দিন ছিলেন সমস্ত দিন কেবল নির্জ্জনে ধ্যান যোগসাধনে অতিবাহিত করিতেন। প্রাতে উঠিয়া সুদূর অরণ্যমধ্যে নির্ঝরতীরে গিরিগুহাভ্যন্তরে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মপূজা আরম্ভ করিতেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাসায় ফিরিতেন। বিরলে একাকী ব্রহ্মসম্ভোগ তাঁহার একটি অতিশয় সুখের ব্যাপার ছিল। নির্ঝরতীরে গিরিগুহায় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া গভীর যোগানন্দ এবং ভক্তির যে সকল বর্ণনা করিতেন তাহা শ্রবণে সকলের চিত্ত প্রলুব্ধ হইত। সেই সেই স্থানের বর্ণনা এবং মনের ভাব যাহা মুদ্রিত আছে তাহা পড়িলে হৃদয় এখনো আরাম লাভ করে। উদরম্ভরী লোকে সুখাদ্য ভোজন করিয়া যেমন গল্প করে, ব্রহ্মসম্ভোগ সম্বন্ধে ইহাঁর ঠিক সেইরূপ গল্প ছিল।

পশ্চিম হইতে প্রত্যাগত হইয়া কিছু দিবসান্তে আসাম অঞ্চলে গমন করেন। সে দেশে তৎকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক ভালরূপে প্রকাশিত হয় নাই, ইহাঁর দ্বারা তথায় নূতন সমাজ এবং কয়েকটি ব্রাহ্ম বৃদ্ধি হয়। জাহাজের কাপ্তেন বিনা মূল্যে ইহাঁকে লইয়া যান এবং পথে আহারাদিও সংগ্রহ করিয়া দেন। অঘোরনাথ আসামের প্রধান প্রধান স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। গৌহাটীতে আদরের সহিত গৃহীত হন। পথে যাইবার সময় জোঁক মশা হিংস্র জন্তু

কর্তৃক পুনঃ পুনঃ আক্রমিত হইয়াছিলেন। আহারের বিশেষ কষ্ট অনুভূত হইত। এক দিন বনের মধ্যে এক বাঘের মুখে পড়েন। আসামের পথ অতি দুর্গম, খাদ্য কষ্ট অতিশয়, এ সমস্ত তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সুরম্য স্থান পাইলে তাহাতে একাকী উপাসনা করিতেন। প্রত্যাগমন কালে ময়মনসিংহ ঢাকা হইয়া কলিকাতা আসেন। ময়মনসিংহে তিনি কিরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন তত্রত্য কোন ব্রাহ্মবন্ধুর লিখিত নিম্নলিখিত পত্রে তাহা প্রকাশ পাইবে।

"১৮৬৫ সনের ডিসেম্বর মাসে ভক্তিভাজন আচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে সাধু অঘোরনাথ প্রথম এখানে আগমন করেন। তখন তিনি অল্প দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সমাজে উপাসনা ব্যতীত বিশেষ কোন কার্য্য করেন নাই বটে, কিন্তু সেই সময়েই তিনি স্বীয় উন্নত জীবনের প্রভায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরে ১৮৭০ সনের আগষ্ট মাসে এ স্থানে আগমন করিয়া ২০।২৫ দিন অবস্থিতি করেন। তখন দুই দিবস তাঁহার দুইটী তেজস্বিনী বক্তৃতা হয় এবং প্রতিদিন তিনি যোগ ভক্তি ও ঈশ্বরকরুণা আদি বিশেষ বিশেষ গভীর তত্ত্বের উপদেশ দান করেন। সেই সকল অমূল্য উপদেশে ব্রাহ্মগণ জীবনে অত্যন্ত উপকার লাভ করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে আর কখনও এখানে কেহই এরূপ গভীর তত্ত্ব প্রচার করেন নাই। অনেকের

নিকট উক্ত উপদেশ সকল লিখা আছে। তাহা মুদ্রিত হইলে পৃথিবী জানিতে পারিবে যে ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে তিনি কিরূপ ধর্ম্মের প্রভা বিকীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমপূর্ণ প্রশান্ত সুমিষ্ট জীবন এখানকার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মন্দিরে এক দিন উৎসব করিয়াছিলেন। সেই দিবস আমরা আট নয় জন তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হই। পরমশ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় প্রচারক মহাশয় সেই সময়ে আমাদের মধ্যে স্বর্গের নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়া যান। তাঁহার পরলোকগমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। সে যাহা হউক তিনি যে উন্নত পবিত্র জীবন পৃথিবীতে রাখিয়া গেলেন তদ্দারা পৃথিবী চিরকাল উপকার লাভ করিবে।"

এই সময় তিনি "ধ্রুব প্রহ্লাদ" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা ভক্তিরসপূর্ণ গ্রন্থ, ইহার রচনা অতি মধুর, এবং হৃদয়গ্রাহী। এই পুস্তক দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং অদ্যাবধি তাহা বিক্রীত হইয়া থাকে। অনন্তর কয়েক বৎসর কলিকাতায় বহুবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সপ্তাহে সপ্তাহে "সুলভ সমাচার" পক্ষে পক্ষে "ধর্ম্মতত্ত্ব" এবং প্রতি দিন তিন চারি ঘণ্টা স্ত্রীবিদ্যালয়ে শিক্ষা দান, এই গুরুতর কার্য্য তিনি একাকী নির্ব্বাহ করিতেন। ইহা ব্যতীত জিজ্ঞাসুদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান ও রজনীতে স্থানে স্থানে উপাসনার কার্য্য করিতেন। তাহার পর উড়িষ্যা-

দেশে প্রচারার্থ গমন করেন। কটক, পুরী, বালেশ্বর, ঢেন্‌কানল প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়া কলিকাতায় আসেন। পুরীর জনৈক মহন্ত এবং ঢেন্‌কানলের মহারাজা আমাদের বন্ধুকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা স্বীয় ভবনে পারিষদবর্গের সহিত তাঁহার মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। অঘোরনাথের ঋষিভাব ভক্তিমান্ হিন্দুদিগকে স্বভাবতঃই মোহিত করিত। তাহার পর এলাহাবাদকে মধ্য বিন্দু করিয়া হিন্দুস্থানের জব্বলপুর, মেরজাপুর, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা প্রভৃতি বড় বড় নগরে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। এই সময় কিছু দিন উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পশ্চিম প্রদেশে সময়ে সময়ে হিন্দিতে বক্তৃতা ও উপাসনাদি করিতেন। এলাহাবাদে থাকাকালীন স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে লইয়া প্রতিদিন একত্র উপাসনা করিতেন, ব্রাহ্মিকাদিগকে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। ইহা দ্বারা সেখানে বিশেষ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। এ যাত্রায় তিনি উত্তর পশ্চিম ও বেহার প্রদেশে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন।

তদনন্তর কলিকাতায় আসিয়া বিধিপূর্ব্বক যোগশিক্ষা এবং তৎসাধনে প্রবৃত্ত হন। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী যৎকালে শালিখার বাটীতে বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া রোগশয্যায় মুমূর্ষু প্রায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময় অঘোরনাথ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া পণ্ডিতের শেষ ক্রিয়া

সম্পন্ন করেন। পাকড়াশী মহাশয় আদি সমাজের প্রচারক ছিলেন, কিন্তু চরমকালে আমাদের বন্ধুকে মৃত্যুশয্যায় প্রাপ্ত হইয়া শান্তি এবং সদ্ভাবে আর্দ্রচিত্ত হন। সকল প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানেই অঘোর নাথকে দেখা যাইত।

"শ্লোকসংগ্রহ" গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কারের পরিবর্দ্ধিত আকার তাঁহারই পরিশ্রমের ফল। সমুদায় হিন্দু শাস্ত্র অন্বেষণ পূর্ব্বক যোগ ভক্তি নীতি বৈরাগ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে বহুতর শ্লোক তিনি সংগ্রহ করেন। তাঁহার সেই পরিশ্রমের ফল ব্রাহ্মসমাজ এক্ষণে বিনা আয়াসে ভোগ করিতেছে। দেবর্ষি নারদের জীবন এক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। "ভক্তমালা" গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অনেক গুলি সাধুচরিত সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে সে রচনাগুলি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। অনেক গুলি ভক্তের জীবনী তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। যোগধর্ম্ম সাধন ও পালনের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অঘোরনাথ সর্ব্বদা বিচরণ করিতেন, অথচ আপনার স্বর্গীয় ব্রত আচরণে কদাপি বিচলিতচিত্ত হন নাই। সংসারের অবস্থা চির দিন প্রতিকূল, বাসস্থান নাই, অন্নবস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট এবং যথাবৎ উপায় নাই, অথচ পুত্র পরিবার আছে, সময়ে সময়ে এ জন্য তাঁহাকে বিষম পরীক্ষায় পড়িতে হইত। এ প্রকার সাধুর আবার পুত্র পরিবার কেন? যিনি যোগী হইবেন তাঁহার পক্ষে চির-

কৌমারব্রত আচরণই প্রশস্ত, এই কথা অনেকের মনে হইতে পারে। কিন্তু অঘোরনাথ ঘোর প্রতিকূলতার মধ্যে দারপরিগ্রহ করিয়া স্বীয় জীবনের ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য মহত্ত্ব আরো উজ্জ্বলরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি এ সম্বন্ধে সক্রেটিসের ন্যায় সহিষ্ণু ছিলেন। পারিবারিক জীবনে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইয়াও তিনি উত্তেজিত হইতেন না, বরং কাঁদ কাঁদ হইতেন; কখন বা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। কিন্তু এ সকল পরীক্ষা তাঁহাকে কোন দিন প্রভুর সেবা হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই।

এই অবস্থায় ভাই অঘোরনাথকে একবার পুত্রশোকের নিদারুণ আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল। এক দিকে দ্বিতীয় পুত্র মৃত্যুশয্যায় পতিত, অন্য দিকে ব্রহ্মমন্দিরে সাম্বৎসরিকের আনন্দ কোলাহল। সেই অবস্থায় পুত্রকে গৃহে রাখিয়া উৎসবের প্রাতঃকালীন উপাসনায় যোগ দিলেন, কিন্তু অপরাহ্নে আর পারিলেন না। সেই রজনী-তেই পুত্র পরলোকে চলিয়া গেল, তাহার মাতা দুর্ব্বিষহ শোকে কাঁদিতে লাগিল, নিকটে বন্ধুবান্ধব নাই, একা এক মতবিরোধী অধিবাসিগণের মধ্যে বসতি, পার্শ্বে মৃত শিশু, সংযতচিত্ত যোগী অঘোরনাথ তখন মৃত সন্তানের দিকে বিমুখ হইয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানে মগ্ন হইলেন এবং তাঁহার দুই চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। দুই তিন ঘণ্টা এই ভাবে স্থির হইয়া দুঃসহ শোকযাতনা সহ্য

করিলেন। দুঃখ পরীক্ষার সময় তিনি আত্মীয় বন্ধুগণের মুখাপেক্ষা করিতেন না, বীরের ন্যায় সমস্ত সহ্য করিয়া থাকিতেন। সহযোগী বন্ধুগণের ঔদাসীন্য কখন তাঁহাকে কর্ত্তব্যবিমুখ বা চঞ্চল করিতে পারে নাই। তাঁহাদের নিকট অনেক সময় উপযুক্তরূপে সাহায্য সহানুভূতি পাই-তেন না, তথাপি অম্লান বদনে তাহা উপেক্ষা করিতে পারিতেন।

১৭৯৭ শকের ১৩ ফাল্গুনে ভাই অঘোরনাথ বিধিপূর্ব্বক যোগশিক্ষা এবং তৎসংক্রান্ত ব্রতসাধনে প্রবৃত্ত হন। যোগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ দেখিয়াই আচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে যোগশিক্ষার্থীর পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বৃহৎ ব্রতাচারী যোগার্থীর ন্যায় যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ভাই অঘোর কয়েক মাস কলিকাতায় এবং সাধনকাননে অবস্থিতি করেন। এইকালে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার যেরূপ আচরণ আমি দেখিয়াছি, তাহা অতীব মনোহর। বন-বাসী ঋষি তপস্বীর মত তিনি নিত্যব্রত পালন করিতেন। অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া নামগান শাস্ত্রপাঠে মগ্ন হই-তেন, তদনন্তর উপাসনাদি করিয়া গীতা যোগবাশিষ্ঠ পড়িয়া আমাদিগকে শুনাইতেন, পরিশেষে স্বহস্তে রন্ধন পূর্ব্বক আহার করিয়া লেখা পড়ায় নিযুক্ত থাকিতেন। আবার সন্ধ্যার পূর্ব্বে আচার্য্যসমীপে যোগধর্ম্ম শিক্ষা

করিয়া সঙ্কীর্ত্তনাদির পর নির্জ্জনে যোগাভ্যাসে মগ্ন হইতেন। তদনন্তর সৎপ্রসঙ্গ সাধুসঙ্গ করিয়া গভীর নিশীথকালে একাকী ব্রহ্মসম্ভোগ করিতেন। পূর্ব্ব এবং পর, জীবনেও প্রায় এইরূপ নিয়ম ছিল, কিন্তু কয়েক মাস দৃঢ়তার সহিত এই প্রকার নিয়মে বদ্ধ থাকেন। উপাসনান্তে প্রতিদিন কুটীরপ্রাঙ্গণে বসিয়া যে ভাবে হিন্দু যোগশাস্ত্র পাঠ করিতেন তাহার মাধুর্য্য বিস্মৃত হইবার নহে। সাধনকাননে এই প্রণালীতে দিন যাপন করিতেন। সেখানে স্বহস্তে এক কুটীর নির্ম্মাণ করেন তাহাতে রন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হইত। ভারতাশ্রমে মঙ্গল বাটীতে তাঁহার হস্তপ্রস্তুত উপাদেয় অন্ন ব্যঞ্জন প্রচারকগণ সকলেই আহার করিয়াছেন। রন্ধন কার্য্যে তিনি বিলক্ষণ সুদক্ষ ছিলেন। এইরূপে সংযম নিয়ম ধ্যান ধারণা সেবা ভক্তি সাধন দ্বারা যোগজীবনকে বিধিপূর্ব্বক পরিমার্জ্জিত করিয়া তিনি পশ্চিম প্রদেশে পুনরায় প্রচারে বাহির হন। বিদেশ ভ্রমণকালেও উপরিউক্ত নিয়ম সকল পালন করিতেন, উপাসনার আসন এবং রন্ধনপাত্র সঙ্গে রাখিতেন। একদা উৎসবের উপাসনাকার্য্যে লাহোর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসকগণের সহিত নিযুক্ত আছেন ইত্যবসরে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বহুশিষ্য সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজীর সহিত অঘোরনাথ ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত ছিলেন। প্রত্যাগমন কালে দেরাদুনে গমন করেন। তথায় নিকটস্থ এক নির্জ্জন গিরিহ্বরে দুই জন

বনচারী ঋষির সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। ঋষিদ্বয়ের মধ্যে এক জন মৌনব্রতধারী, অপর জন গীতাশাস্ত্র পাঠ করিতেন। তাঁহার সঙ্গে আমাদের বন্ধুর ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। কয়েক দিন তিনি সেই রম্য বনে পর্ব্বতগুহায় বাস করেন। হিন্দু যোগিদ্বয়ের পার্শ্বে বসিয়া গৃহর্ষি অঘোরনাথ প্রকৃত তপস্বীর ন্যায় নির্জ্জন বাস করিতেন। ইহার পর বৎসর তিনি ত্রিহুত মতিহারী হইয়া সারণে যাত্রা করেন। মধ্য পথে মাঠের মধ্যে এক পান্থশালায় ভয়ানক বিপদে পড়িয়া ছিলেন। লেখক কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সেই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—

"প্রিয় বন্ধু! আজ আপনাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করি। আমি পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। বাস্তবিক পৃথিবীর নিকটতো আমি বিদায় লইয়াছিলাম, আমার সে মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইল কে? আমায় আবার পৃথিবীর ক্রোড়ে আনিল কে? আমি ধূলি অপেক্ষা অসার, আমি অসারের অসার, এই দুই কথা আমার হৃদয়ে রক্তের সহিত লিখিত থাক্। আমি তো সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছিলাম, আবার আমায় পত্র লিখিতে বসাইল কে? আমার পাগল মন এখন প্রিয় সখার কথা শুনিতে ভাল বাসে, তাঁহার কোন্ কথা বলিতে গেলে আমার হৃদয় ভাবের তরঙ্গে ও নয়ন অশ্রুজলে ভাসিয়া যায়, এজন্য সে

কথা আর কাহাকে বড় বলিতে ইচ্ছা হয় না। লিখিতে গেলে চক্ষের জল, খেতে বসিলে চক্ষের জল, উপাসনায় বসিলে চক্ষের জল। আমি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এত দিন আমি কত লেখা পাঠাইতে পারিতাম। আমি একা বসিয়া থাকি আর সেই সুখের তরঙ্গে ভাসি, কিছু দিন এইরূপে যাইবে। এখানেও আসিতাম না, কেবল অঙ্গীকার করিয়াছিলাম বলিয়া। এ ব্যাপারটা কাউকে বলিতে ইচ্ছা করে না, বলিতে শারীরিক এক প্রকার ক্লেশ হয়, ও মন কি অদ্ভুত ভাবের ভিতর মগ্ন হয় তাহা আর প্রকাশ করিতে পারি না। যেখানে এই ব্যাপার হয় সেই স্থানটি ছাপরা হইতে নয় ক্রোশ অন্তরে। তাহার নাম ইস্‌বাপুর, বিখ্যাত চোরের গাঁ পরে শুনিলাম। আমি সাম্পনি গাড়িতে আসিতেছিলাম। ঠিক সন্ধ্যার সময় এখানে উপস্থিত হইলাম। আর কোন পথিক রহিল না, এবং সেখানে যে একা কি গরুর গাড়ি থাকে না তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গেল। কেবল আমিই একা সেখানে থাকিলাম। দোকানদারেরা দোকান তুলিয়া চলিয়া গেল। সরকারী রাস্তার উপর গাড়ি খানি রাখা গেল। এক খানি তাড়ি ও মদের দোকান আছে তাহাতেই জন কয়েক লোক থাকিল। একটী লেটারবক্স খাম্বার উপর ঝুলান রহিয়াছে। এখানে ডাকবানারদের একটী আড্ডা আছে, তাহাদের জন্য এক খানি ঘরও দেখিলাম। সে

দিন রবিবার বলিয়া গাড়িতেই সামাজিক উপাসনা করা গেল। আপনার নিয়মিত সায়ংকৃত্যাদি সমাপন করা গেল। কিন্তু মনের ভিতর এক প্রকার অজ্ঞাত আশঙ্কা হইতে লাগিল। কেমন যেন আপনাকে নিরাপদ মনে হইল না। রাত্রি যখন ৯। ১০ টা হইবে, গাড়ির বিশ হাত তফাতে এক ক্ষেতে বসে জন তিনেক লোক কি পরামর্শ করিতে লাগিল। ঐ ঘটনাতে আমার মনে নানা প্রকার চিন্তা আসিল। আবার ভাবিলাম, হয় তো পথিক লোক বসিয়া আছে, মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছি কেন? অবশেষে জল খেয়ে শুইলাম। কিন্তু বুক্ দুড় দুড় করিতে লাগিল। আবার তাঁহার নাম ও সহবাস স্মরণ হওয়াতে সে দুর্ব্বলতাটী চলিয়া গেল। খানিক ঘুম হইল, কিন্তু মশার কামড়ে ঘুমটি ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপ দুই তিন বার তন্দ্রা আসিতেছে, আবার জাগিতেছি। কিন্তু তাড়ির দোকানের জটল্লা আর ভাঙ্গে না। অবশেষে শেষ বারে যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন প্রায় রাত্রি দুইটা হইবে। চারি দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, নিশীথ সময়, প্রকৃতির নিস্তব্ধতা, কুকুর গুলো ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিতেছে। আমি সেই সময় উঠিয়া বসিলাম। মনটা খুব ভাবের তরঙ্গের ভিতর ডুবিয়া গেল। বেশ সম্ভোগ করিতেছি, এমন সময় একটা ডাকাতে হাঁক উঠিল; সহসা আমার মন সে রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিল, সর্ব্বশরীর ডোল হইয়া উঠিল। সেই হাঁকে বোধ

হয় জন ১০।১২ লোক ডাকাতি রকমের হাঁক দিতে দিতে তাড়ির দোকানের নিকট আসিল। সেই হাঁকে বাস্তবিক পেটের পীলে চম্‌কে যায়। আমার মন সম্পূর্ণ অসহায় হইয়া ভয়ে দুঃখে তাঁহাকে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। খানিক একান্ত নির্ভরের সহিত দয়াময়কে ডাকিতে লাগিলাম। কিছু পরে তাহাদের মধ্যে গোলমাল উঠিল। কেহ কেহ ক্রমাগত গালি দিতেছে, কেহ বা মাটীতে আস্ফালন করিতেছে ও লাঠির দ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতেছে, আবার কেহ ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে, "শালা ছোটা হ্যায়, হাম্‌ একেলা এক লাঠিসে শির তোড় দেঙ্গে"। খানিক পরেই এক জন বলিয়া উঠিল "বস্‌ আবি লোটো।" আর এক জন বলিল "হাঁ, আউর ক্যা! আবি লোটো, আউর মার্‌ডালো।" এই কথা শুনিবা মাত্র আমি অস্থির হইয়া গেলাম, জীবনের সমুদায় আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে গিয়া লুক্কায়িত হইলাম। উঃ! আর বলিতে পারি না। ভয় দুঃখ হুতাশে সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, আমি চীৎকার করি, আবার ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল, দূর অবিশ্বাসী! অবশেষে চারিটা কালান্ত যমের মত চেহারা, প্রকাণ্ড লাঠি হাতে করিয়া গাড়ির কাছে চারি দিকে দাঁড়াইল। একজন ডাকিতে লাগিল, "আরে বয়েলোঁয়ান্‌! (গাড়োয়ান) উঠো!" ইহার মধ্যে দল হইতে আর একজন লোক আর

এক গাঁয়ের লোককে ডাকিতে লাগিল। কেবল এই কথাটী বুঝিতে পারিলাম, "হুশিয়ার রহো"। আমার মন তখন উন্মত্ত প্রায় হইয়াছে, বড় সংজ্ঞা নাই। সেই অবস্থাতেই আমি তাহাদিগকে কি বলিতে লাগিলাম। কি বলিয়াছি সব কথা মনে নাই; যাহা আছে তাহা এইরূপ ভাবের;— "দেখ, আমি সেরূপ বাবু নই, গাড়ি দেখে তোমরা মনে করিতে পার আমার নিকট অনেক টাকা কড়ি আছে, কিন্তু আমি কোন চাকৃরি করি না, কেবল ভগবানের নাম করে ও ভজন করে বেড়াই, তবে যাহা আছে তাহা তোমবা লইয়া যাও।" এই কথা বলিতে বলিতে আমি হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। "তু দয়াল দীন হোঁ, তু দানী হোঁ ভিখারী" আর "ঠাকুর ঐ সো নাম তোমারা" এই দুই হিন্দি ভজন গাইয়াছিলাম। এই ভজন গাইতে গাইতে কখন যে অজ্ঞান হইয়াছিলাম তাহাও আমি জানি না। শেষে আমার বাহিরে যে কোন অবস্থা হইয়াছে তাহা আর মনে ছিল না। প্রিয়সখার সহবাস ও দর্শন-সুধার মধ্যে মন ডুবিয়া গিয়াছিল। প্রথম যখন ঐ রূপ ভাব হয়, তখন আমার গাড়োয়ানকে ডাকিতে ইচ্ছা হয় নাই, ভয়ে দুঃখে আমি তাঁহার নিকট এমন ভাবে গিয়াছিলাম যে, তাহা আর নিজে কিছু বলিতে পারি না। হায়! পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আর আপনাতে ছিলাম না। আমি আর তাঁহার প্রেমের কথা

বলিব না, কেন না তাহার উপযুক্ত নই। খানিক পরে দেখি আর কোন গোলমাল নাই। আমার বয়সে এমন কান্না কাঁদি নাই, প্রাণের দায়ে যেন ছেলে মানুষের মত হইয়া গিয়াছিলাম। হায়! কি সুন্দর ভাব। এ সব ভাব আর আমার প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না, যেন গোপনের ধন গোপনেই রাখি। খানিক পরে এক জন বলিতেছে, "আরে উয়ো ভগৎ হ্যায়।" বাস্তবিক আমার জীবনের মূল্য নাই, সকলই তাঁহার, কেবল পাপ আমার। আপনাদের চরণধূলিরও উপযুক্ত নহি। আমি এ ব্রত ধারণের কোন উপযুক্ত পাত্র নহি। কি জানি আমার কেবল এই কথাই মনে হয়। তাঁহার প্রেম আমার সর্ব্ব শরীরের রক্ত, তাঁহার পদধূলি আমার মস্তকের ভূষণ, আপনাদের চরণধূলি আমার চক্ষের অঞ্জন। আমি আর এ পৃথিবীর বাস্তবিক উপযুক্ত হইলাম কৈ? বাস্তবিক সে সেবা করিলাম কৈ? সকল বন্ধুদিগকে আমার প্রণাম দিবেন। আমি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ অভিলাষ করি। আমি তাঁহাদের অস্পর্শীয়, এ অপবিত্র জীবনের শোভা আপনারা। আমার নয়নের জল এখন থামায় কে? তবে এই পর্য্যন্ত রহিল। কি আশ্চর্য্য! আমার কিছুই অপহৃত হয় নাই।"

উল্লিখিত বিপদ তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোত খুলিয়া দিয়াছিল। এই ঘটনার অল্প দিন পরে লেখক এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এই দুই খানি পত্র লিখিয়াছিলেন;—

(১) "প্রিয় বন্ধু! আজ একটা উপহার দিতেছি * । বিপদের দিন সেই স্থান ছেড়ে ভোরে আসিতে আসিতে আমার মনে অনেক রকম ভাব হইয়াছিল। তাহার একটা ভাব পাঠাইতেছি। আপনি তাহাকে সেরে স্থরে একদিন আমার হয়ে খাস উপাসনাতে ও বাড়ী গাইবেন।

'তব প্রেমে সদা আমি ভাসিব, এবার আমি তোমায় হেরে এ প্রাণ ত্যজিব।

সেবিব তব চরণ, দিয়ে দেহ প্রাণ মন, তোমারে দিয়ে জীবন ও চরণে পড়ে রব।

নামরসে মত্ত হয়ে, প্রেমেতে পাগল হয়ে, দীন বেশে দ্বারে দ্বারে তব গুণ গাইব।'

মনটা বড় ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু ভাবের লোক পাব কোথায়? এ পাপজীবনকে ভাবরসে ডুবিয়ে রাখি। সত্য বল্‌ছি, আমার কত কথা যে মনে আসে তাহা আর বলিতে পারি না।"

(২) "তুমিই বা কোথায়, আমিই বা কোথায়, এবার পরলোক হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়াছিলাম। হায়! যাঁহার নাম করি তিনি কি ভাল বাসেন! এবার তবে তাঁহাকে খুব ভাল বাস, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া বৈরাগিণী হও। আর জীবনে সুখ কি বল, দেখিলে তো? এখনো তাঁহাকে কি বিশ্বাস করিতে পারিবে না? এই বার আমার সঙ্গে খুব একত্রিত

হও, আর সেই প্রভুকে জীবনটা দেও, তাঁহাকে মনের সহিত ডাক, দেখ মরা মানুষ তিনি বাঁচাইলেন। আমি তো মরিয়া গিয়াছিলাম। ইহলোকে যে আর ফিরিব এমন তো মনে ছিল না। সকলই সেই দয়াময়ের ইচ্ছা। তোমরা সকলে ভাল হও। সকলে তাঁহার প্রেমে মত্ত হও, আর আমার জন্য প্রার্থনা কর। আশ্রমের সকল মেয়েদের চরণে আমি প্রণাম করি। তাঁহাদের চরণধূলি আমার বক্ষে এখনো আছে, তাই আবার ইহলোকে আসিলাম।"

বিদেশে প্রচার করিতে গিয়া সময়ে সময়ে তাঁহাকে অনেক অসুবিধা ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় পড়িয়া তিনি জীবনকে অধিকতর বিশ্বাসী করিতে পারিয়াছিলেন। কত বার কত স্থানে এমন ঘটিয়াছে, বহু কষ্টে কোন গৃহস্থ ভবনে বা দোকানে স্থান পাইলেন। শেষে আবার তাঁহার সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া গৃহস্বামী শ্রদ্ধা প্রকাশ করিল, আদর করিয়া খাওয়াইল, দুই এক দিন থাকিয়া যাইতেও অনুরোধ করিল। যোগী অঘোরনাথের শুদ্ধাচার, ইষ্টনিষ্ঠা, ঋষিভাব বিশ্বাসী হিন্দুদিগের মনকে আকর্ষণ করিত। এ বিষয়ে তাঁহার মুখে আমরা যে সকল গল্প শুনিয়াছি তাহা অতি আশ্চর্য্য এবং মনোহর।

এই ব্যাপারের পর কিছু দিন মুঙ্গের আরা গাজিপুর পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রচার কার্য্যে তিনি ব্রতী থাকেন। তদনন্তর মঙ্গলবাটী নামক নূতন ভবনে সপরিবারে বাস

করেন। এক্ষণে আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আশ্রয়হীন অর্দ্ধাহারী পথের কাঙ্গাল রহিলেন না। যে দেবতার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন সেই দয়াময় বিধাতা তাঁহাকে নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, দুইটি পুত্র, একটী কন্যারত্ন দান করিলেন, শরীররক্ষণোপযোগী অন্ন বস্ত্রের অভাবও পরিপূর্ণ হইল। এক্ষণে ভাই অঘোরনাথ সবল সুস্থ শরীর এবং অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অবস্থায় স্থাপিত হইলেন। সবল শরীর এবং পবিত্র অন্তঃকরণে প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। সুলভ সমাচারের সমগ্র ভার লইয়া চালাইতেন তৎসঙ্গে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। পূর্ব্ববৎ সাধনানুষ্ঠানও রহিল। তাঁহার পরিশ্রমে প্রচারকণ্ডে প্রচুর অর্থাগম হইত, পক্ষান্তরে লোকের আধ্যাত্মিক সম্বল বৃদ্ধি পাইত। বিধাতা তাঁহাকে ক্রমে পরিবার মধ্যেও শান্তি অনুকূলতা আনিয়া দিলেন। সহধর্ম্মিণী সেবা ভক্তি দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মব্রতের সাহায্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সংসার পরিবার আর তাঁহার পরীক্ষার বিষয় রহিল না। এই সময় তিনি আর একবার কাঁথি মেদিনীপুর উড়িষ্যা দেশে যান। পথের বিবরণ এই পত্রে কিছু প্রকাশিত হইবে।

"১৬ই বৈশাখে আমি কলিকাতা হইতে যাত্রা করি। ষ্টীমারযোগে উলুবেড়ে আসিয়া উপস্থিত হই। গঙ্গায় প্রবল তরঙ্গ ও প্রতিকূল বাতাস বলিয়া তমলুক দিয়া কাঁথি

যাইতে হইল। পর দিন রাত্রি দশটার সময় তমলুকে পৌঁছিলাম। যাঁহার বাসায় উঠিয়াছিলাম তাঁহার সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না। তিনি স্থানীয় মুনসেফের সেরেস্তাদার। কথাবার্ত্তায় জানা গেল তিনি এক সময়ে মেদনীপুর ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। লোকটি কিছু শান্ত ভীরুস্বভাব বলিয়া তথায় ধর্ম্মের কোন রূপ আন্দোলন হয় এরূপ ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘটিয়া উঠিল না। তথায় দুই রাত্রি থাকিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ যিনি ভাল বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী লোক তিনি তৎকালে উপস্থিত না থাকায় সেখানে আপাততঃ কোন রূপ কার্য্য করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কেবল দুই চারি জনের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও সঙ্গীতাদি হইল। প্রসঙ্গ শুনিয়া অনেকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মনে অন্যতর সঙ্কল্প হওয়াতে আর তথায় থাকিলাম না। মানুষের হৃদয় প্রকৃত ধর্ম্মের কথা শুনিলে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না। বাস্তবিক এখন ভারত প্রকৃত ধর্ম্মজীবন দেখিবার জন্য তৃষিত চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধান এত মিষ্ট যে ইহার তত্ত্ব শুনিলে লোকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। ১৯ শে শকট্যারোহণে তমলুক ছাড়িলাম। তখন প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। ঘুমাইতে, ঘুমাইতে যাইতেছি, এমন সময় পথের মধ্যে এক স্থানে গাড়ি শুদ্ধ হুড় মুড় করিয়া পড়িয়া গেলাম,

হঠাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল! শরীরে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে বাপু! ব্যাপারটা কি, এরূপ কেন হইল? তিনি কিছু মৃদুস্বরে বলিলেন, আজ্ঞে আমি রাতকাণা। তখন আমার দয়া হইল আর হাসিও পাইল। পর দিন খাজপুল চটিতে বৈকালে গিয়া অবস্থিতি করি। সামান্য চটি, দুই তিন খানি মাত্র দোকান, এক বুড়ীর দোকানে গিয়া বাহিরে বসিলাম। এ দেশের চটিতে প্রায় মন্দ স্ত্রীলোকদের দোকান, কুপথের পথিকেরা প্রায় তাহাদের দোকানেই অবস্থিতি করে। তথায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দেখি দুই জন বাবাজী খোল কর্ত্তাল লইয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে ডাকিয়া বসাইলাম, একটা নাম গান করিতে অনুরোধ করাতে বাবাজীরা গাহিলেন। বাবাজীর নাম গান কেবল গোপাল মাঠে গরু চরাইতেছেন, মনঃপূত না হওয়াতে মন কেমন করিয়া উঠিল, খোলটি লইয়া নিজে কীর্ত্তন করিতে উৎসাহ হইল। ক্রমে বেশ লোক জড় হইল, আমার ভাব হইল, আবার নাম করিতে মন মত্ত হইল, গাইতে গাইতে বড় আরাম হইল, উপস্থিত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া হরিদর্শনের কথা বলিলাম; তখন সকলে ভারি খুসী, অনেকে আমার কাছে অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া রহিল, সেই সামান্য লোকদের সঙ্গে অনেক বিষয় গল্প করিয়া ভাল করে সময় কাটান গেল। সন্ধ্যার পর

খুবঝড় বৃষ্টি হইয়া গেল। আমি আহারাদি করে শয়ন করিলাম, কিন্তু এ দেশে এমন মশা যে কলিকাতা এখন কোথায় লাগে। তাহাদের কামড়ে শরীরের স্থানে স্থানে ফুলিয়া গেল, কিন্তু খুব পরিশ্রান্ত হওয়াতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। খানিক পরে দেখি কে আমায় মশারি টাঙ্গাইয়া দিয়াছে। একটি প্রণাম করিয়া বলিলাম প্রভো! তুমি কি আমার মশার কামড়ও সহিতে পার না! এত ভাল না বাসিলে আর এ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছ কেন? আমি পথের ভিখারী বটে, কিন্তু রাজা অপেক্ষাও যে সুখী; হরি আমার সঙ্গের সঙ্গী।"

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে কয়েক জন প্রচারক অধ্যেতার পদে নিযুক্ত হন অঘোরনাথ তাহার মধ্যে এক জন ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অন্বেষণ এবং তাহার তত্ত্ব প্রকাশ করিবার ভার প্রাপ্ত হন। তাহার পর নববিধান ধর্ম্মের প্রেরিতপদে অভিষিক্ত হইয়া বন্ধুগণের নিকট বিদায় গ্রহণান্তর ভারতের পশ্চিম সীমায় প্রচারার্থ চলিয়া গেলেন আর দেশে ফিরিলেন না। হস্তে বিধান নিশান, বক্ষে প্রেরিতের পদক ধারণ করিয়া বীরবেশে নব বিধানের শুভ সমাচার প্রচার করিবার জন্য নবোদ্যমে পূর্ণ হইয়া তিনি পাঞ্জাবে এবং সিন্ধু নদীর পরপার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। মরি পর্ব্বতে গিয়া কিছু দিন যোগ সাধন করেন, তথায় আহার সম্বন্ধে অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। কোন কোন

দিন গাঁদা ফুল খাইয়া চালাইয়াছেন এইরূপ শুনা গিয়াছে। তাঁহাকে পরম সাধু জানিয়া স্থানে স্থানে লোকেরা ভক্তি করিত, বর চাহিত, কেহ বা পায়ের ধূলা লইয়া কাঁদিত। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। অঘোরনাথের শেষ জীবনের প্রচারবৃত্তান্ত এ স্থলে সংক্ষেপে কিছু প্রকাশ করা গেল। প্রথমে বর্দ্ধমান, পরে মুঙ্গের মোকামা দানাপুর গয়া বাঁকিপুর ডোমরাওন মোগলসরাই হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরে তিনি উপস্থিত হন। বাঁকিপুরে আপনার মাতা ঠাকুরাণীর পরলোক গমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ করেন। জননীর প্রতি কিরূপ ভক্তি ছিল তাহা তাঁহার এই পত্রে প্রকাশ পাইবে।

[বাঁকীপুর] "হায় কি দুঃখ পাইলাম। শেষ কালে মার সঙ্গে দেখা হইল না, তাঁর মনের সাধ মিটাইতে পারিলাম না। এমন সময়ে মার সঙ্গে দেখা হইল না। তাঁর সেবা করিতে পারিলাম না। মনে ভারি দুঃখ রহিয়া গেল। কাল শ্রাদ্ধ করিয়াছি। রীতিমত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া জীবন সান্ত্বনা পাইয়াছে। কাল অন্ধ খঞ্জ দীন দুঃখী প্রায় দুইশ লোককে [illegible] করা গিয়াছে, কার্য্য অতি চমৎকার হইয়াছিল। এমন উপাসনা প্রার্থনা হইয়াছিল যে মা আমার সাক্ষাৎ জীবিত বলিয়া বোধ হইল। এক পয়সা ছিল না,

অথচ টাকা আসিয়া গেল, তাঁর কার্য্য তিনিই করিয়া দিলেন। * * *

তদনন্তর কাণপুর ও টুণ্ডালা হইয়া লাহোর নগরে উপস্থিত হইলেন। পাঞ্জাব প্রদেশ এবার তাঁহার প্রচারক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ উক্ত নগরে অবস্থিতি করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিলেন, বিধান-বিরোধীদিগের কর্তৃক প্রভুর কার্য্যসাধনে বহুতর বাধা পাইলেন, অসহায় অবস্থায় পড়িয়া নানা ক্লেশ সহ্য করতঃ সাধ্যানুসারে ব্রত পালন করিলেন। শেষে বিরোধীদিগের দুরবস্থা দর্শনে ব্যথিত হইয়া রাওয়ালপিণ্ডী চলিয়া যান। সেখানে শিখ হিন্দু নিরাঙ্কারী এবং কয়েকটি ব্রহ্মভক্ত তাঁহার উপদেশাদি ভক্তিপূর্ব্বক শুনিতেন। নানকপন্থীদিগের ধর্ম্মশালা তাঁহার নবীন ধর্ম্মভাব প্রচারের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল। রাওয়ালপিণ্ডীর সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এই পত্র দ্বারা প্রকাশিত হইবে।

"রাউলপিণ্ডী শিখধর্ম্মের একটি প্রধান স্থান। এখানে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৫ পঁয়তাল্লিশটী ধরম্‌শালা আছে। সন্ধ্যার পর সহরের চারি দিকে কীর্ত্তনের রোল উঠে, ব্রহ্মনামে যেন তোল পাড় হইয়া যায়। আমাদের বিধান এত উদার ও ইহার প্রচারিত ভক্তি এত মধুর যে, কোন ধরম্‌শালায় ইহার অনাদর নাই। কেবল যে নিরাঙ্কারীরা বিধানের তত্ত্ব ভক্তিপূর্ব্বক শুনিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু অপরাপর

ধর্ম্মশালাতে বিধানমাহাত্ম্য প্রচারিত হইতেছে। বর্ত্তমান বিধান এত উদার ও মিষ্ট এবং ইনি নিরাকার ঈশ্বরকে এমন সুন্দর ও মধুর ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, যে তাঁহা সকল সম্প্রদায়ের লোকে শুনিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বতন কোন বিধান নিরাকার ঈশ্বরকে এত প্রত্যক্ষ পরিষ্কার সুমিষ্টরূপে দেখাইতে পারেন নাই। এ জন্যই নববিধানের এত মাহাত্ম্য।

"এখানকার তিনটি দোকানদার পঞ্জাবী আমাদের এই উপাসনা গ্রহণ করিয়া এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন, যে তাহা অতীব আশ্চর্য্য। বিশেষতঃ লালাজীর বড়ই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর হইবে, রোকোড়ের দোকান আছে, লেখা পড়া প্রায় কিছুই জানেন না, কিন্তু এমন বিনীত ও ভক্তিতে বিগলিত যে এরূপ প্রায় দেখা যায় না। কার্য্যেতে তাঁহার সাধুতা ও সত্ততা যথেষ্ট। বিশেষতঃ উপাসনা করিয়া তাঁহার জ্ঞান এরূপ উন্নত হইয়াছে যে, বড় বড় পণ্ডিত ও বিদ্বান্‌দিগকে সহজে আমাদের এই উপাসনা ও উচ্চ তত্ত্বসকল বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত উপাসনাতে কিরূপ উন্নতি হয় ও মূর্খ সামান্য লোকের মধ্যে নিরাকার উপাসনা কেমন সুন্দর ও সহজ তাহা ইহাঁর জীবনে বিলক্ষণ দেখা গেল।

"রাউলপিণ্ডীর পল্টন বাজারে প্রতি শনিবার উপাসনা হইয়া থাকে। সেপাই ও দোকানদার লোকেরা প্রায়

ভজন শুনিতে আসে। গত শনিবার উপাসনার দিন তথায় গিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন সুন্দর ঈশ্বর, এমন মধুর ভক্তিবিধান লোকে কেন গ্রহণ করে না? এই ভাবিতে ভাবিতে উপাসনার সময় ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, সে দিন আর প্রণালীপূর্ব্বক ভাল উপাসনা করিতে পারিলাম না। উপাসনান্তে এই ভাবে দুই চারিটী কথা বলিলাম, দয়াময় হরি এই যুগে তোমাদের জন্য যে এই নবভক্তি বিধান ও মিষ্ট উপাসনা পাঠাইয়াছেন তাহা কি তোমরা লইবে না? এস কে লইবে এখনই গ্রহণ কর। তখনই একটি অনুমান ৫৫।৬০ বৎসরের বৃদ্ধ হাত যোড় করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, আমি ইহা বিশ্বাস করিলাম এবং উপাসনা গ্রহণ করিলাম; ধন্য ঈশ্বরের কৃপা তিনি সকলই করিতে পারেন।"

তদনন্তর আমাদের বন্ধু মরি পাহাড়ে অবস্থিতি কালে পাহাড়ী লোকদের সরল বিশ্বাস দেখিয়া বড় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি যোগিবেশে পর্ব্বতকন্দরে দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। এক দিন নিবিড় ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপ-পরিবেষ্টিত মনোহর নির্ঝরের মধ্যস্থ এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া নিমীলিত নয়নে আপনার নিষ্ঠাতে নিমগ্ন ছিলেন। ক্ষণ কাল পরে দেখিলেন যে এক জন বিনীত পাহাড়ী তাঁহার সমক্ষে ভক্তিপূর্ব্বক বসিয়া আছে। আমাদের বন্ধুকে জাগ্রদবস্থায় দেখিয়া সে বলিল "মহারাজ,

আমাকে এক বার স্পর্শ করুন, তাহা হইলে আমি উদ্ধার হইয়া যাইব।” তিনি ঐ পাহাড়ীর এই কথা শুনিয়া কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইলেন, দুই চারিটী ভক্তির কথা বলিয়া সে দায় হইতে কোন রূপে নিস্তার পাইলেন, কিন্তু লোকটি কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে কেহ হাত দেখাইতে আইসে, কেহ পীড়া আরোগ্যের জন্য ছেলে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, রোটী খাওয়াইবার জন্য জেদ করে, কিন্তু তিনি কিছু-তেই সম্মত হইতেন না। তাহাতে কেহ কাঁদিত। বন্ধু মহাবিপদ ও তপস্যার ভঙ্গ দেখিয়া ভাবিলেন, এমন নির্জ্জনেও কোলাহল উপস্থিত হয় কেন? এজন্য তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এক উচ্চতম শিখরে গিয়া বসিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পাহাড়ীরা কিরূপে টের পাইয়াছে। অপর একজন তাঁহাকে সেখানেও গিয়া ধরিয়াছে। সে বলিল, সাঁইজী, আমার পিঠে আপনি একটি কিল মারুন, আমার সব অমঙ্গল কেটে যাবে।” সে দিনও তিনি কোন-রূপে এড়াইলেন। কোন কোন পাহাড়ী তাঁহাকে যে ভাবে ধরিত তাহাতে তিনি বড় সহজে পার পাইতেন না। নিম্নস্থ পাহাড়ের অধিবাসীরা বড় সরল ও বিনীত। তাহা-দের ভাবগতি দেখিয়া আমাদের ভ্রাতা বড় উপকৃত হইয়াছিলেন।

সাধু অঘোরনাথ পঞ্জাবের অন্তর্গত জেলা সাহপুরে নববিধানের জয়পতাকা উড়াইয়া তথায় একটি ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম-

সমাজ স্থাপন করেন। শত শত পঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানী নবভক্তিতত্ত্ব ও ব্রহ্মদর্শনের কথা শুনিতে আসেন। আমাদের ভ্রাতা তথায় এক দিন বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কিছু সন্দেহ থাকে তবে প্রশ্ন করিলে বাধিত হই। তাহার মধ্যে এক জন দীর্ঘাকার আজানুলম্বিতবাহু শিখ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যত দিন চিত্ত নির্ম্মল না হয় তত দিন নির্গুণ ভক্তি কি রূপে সম্ভবে? পরে তিনি যখন বুঝাইয়া দিলেন তখন ঐ লোকটি তাঁহার পদতলে পড়িয়া ক্রমাগত ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। আমি বড় অপরাধী পাপী, এই বলিয়া তাঁহার পা ধরিয়া পড়িয়া রহিলেন।

জীবনের শেষ ভাগে অঘোর কি রূপ উৎসাহের সহিত পিতার আদেশ পালন করিয়া গিয়াছেন,তাহা বর্ণন করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়। রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ভয়ানক দুর্গম মরুভূমি পার হইয়া সুদূর পশ্চিমে ব্রহ্মনাম ঘোষণা করিয়া আসিলেন। পথের বিবরণ তাঁহার নিজ হস্তরচিত পত্রে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত পত্র আমরা এই স্থানে প্রকাশ করিলাম।

"পাঠক! আমি নব বিধানের সুসংবাদবাহকদিগের মধ্যে একজন অনুপযুক্ত ভৃত্য। সাহাপুর হইতে ডেরাস্মাইলখাঁ ১২০ মাইল অন্তর। ঐ আমার গম্য স্থান, ইহা সিন্ধু নদের পরপারে ও ভারতের পশ্চিম সীমার সীমান্তপ্রদেশ। ইহার অল্প দূরেই উজীরদের রাজ্য। এক

সুবিস্তীর্ণ পাহাড় দুই রাজ্যকে বিভাগ করিয়া দিয়াছে। ঐ পাহাড়ের নিম্নভূমি পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীন। সুতরাং উজীরেরা মধ্যে মধ্যে নিম্নস্থ নগরবাসীদের উপর উপদ্রব করিয়া থাকে। ছয়মাস হইল কতকগুলি (প্রায় ৩০০ শত) অসভ্য পাহাড়ী টাঁক নামক গ্রাম লুট করে, ঘর জ্বালাই দেয়। আমাদের ইংরাজ বাহাদুরের কাছে কাহারিও প্রতাপ খাটে না, এক Expedition দল উহাদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্য তথায় প্রেরিত হয়। প্রধান সর্দ্দার উজীর ও যতলোক তাঁহার সঙ্গে ছিল, সকলকে ধরিয়া আনিয়া কয়েদ দেওয়া হয়। সংক্ষেপে গন্যস্থানের বিষয় বলিলাম।

ঐ এক শত বিশ মাইল পথ কি দুর্গম তাহা আর বলা যায় না। কেবল মরুভূমি, ৮।১০ ক্রোশ অন্তর এক এক গ্রাম। পথে বিন্দুমাত্র জল নাই, যেখানে এক একটী কূপ তথায় বসতি, নতুবা কেবল স্তূপীকৃত পর্ব্বতসমান বালুরাশি ধূ ধূ করিতেছে। দিবসে ভয়ানক গরম, কাহাব সাধ্য যায়, পথিকেরা প্রায় রজনীতেই যাতায়াত করিয়া থাকে। এই দুর্গম পথে উষ্ট্র ভিন্ন আর অন্য কোন যান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দুরন্ত পাঠানেরাই উষ্ট্রারোহণে বিশেষ সুদক্ষ, আমি কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী, কিরূপে যাইব ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু ভিতরে আমার নেতা বলিলেন "হুকুম মহারাজের।" আমিও অমনি মস্তক

অবনত করিয়া করযোড়ে বলিলাম, "যো হুকুম মহারাজ।"

অনন্তর অষ্টমী পূজার দিবস সায়ংকালে আমি শাহাপুর পরিত্যাগ করিয়া উষ্ট্রারোহণে ডেরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কতক দূর গিয়া এক পান্থনিবাসে বিশ্রাম করা যায়। ঐ বিশ্রাম স্থান পর্য্যন্ত লোকালয় শেষ হইল। পরে যখন চন্দ্রমা অস্তমিত হইল, তখন পুনরায় আমরা ঘোর নিশীথ সময়ে নিবিড় তিমিরাবৃত মরুভূমি দিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। সকলের বিশ্রাম আছে, কিন্তু উষ্ট্রের আর বিশ্রাম নাই। উহার মত নিরীহ ও সহিষ্ণু জন্তু প্রায় দেখা যায় না। উহার দীর্ঘ গ্রীবাটী উষ্ট্রপরিচালকের ভাণ্ডার। আমার প্রকাণ্ড পানপাত্র তাহার গলায় লম্বমান, যেন সাফরিদের মাদুলী ঝুলিতেছে। অন্ধকার রজনীতে মরুভূমি দিয়া চলিতে চলিতে পথিকেরা প্রায় পথভ্রান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা! আকাশের তারা পথভ্রান্তি দূর করিয়া দেয়। আমার উষ্ট্রপরিচালক নিদ্রায় অচেতন হইয়া এক এক বার ঢলিয়া পড়িতেছে, আর তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া পথ নিরূপণ করিয়া লইতেছে। কিন্তু আমি এক প্রকার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলাম। উপরে অনন্ত আকাশ ও নিম্নে সুবিস্তীর্ণ শুভ্র বালুরাশি, এই মাত্র কেবল আমার নয়ন পথে পতিত হইল। ভাবিলাম, এই সুবিস্তীর্ণ অন্ধকারসাগরের মধ্যে

ঊর্দ্ধে কত উজ্জ্বল আলোক, শত শত নক্ষত্র অপূর্ব্ব ভাবে শোভা পাইতেছে। যোগরাজ্যেও ত এইরূপ। প্রথমে গভীর অন্ধকার পরে তাহার মধ্যে যত চিত্ত স্থির হয়, বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়, তত ঐ অন্ধকারের ভিতর কোটী সূর্য্য বিরাজমান দেখা যায়। উহার অনুপম তেজে আত্মা তেজস্বী ও বিমল জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়। অনন্ত জ্যোতির সাগরে যোগীর চিত্ত ডুবিয়া যায়, তদবস্থায় আত্মজ্যোতিঃ নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া থাকে। প্রকৃত অভেদ জ্ঞান এই সময়ে প্রতীত হয়। স্বরূপতঃ ভেদ সত্ত্বে অভেদ ইহাকেই বলে। বর্ত্তমান বৈদান্তিক সাধুগণ এইরূপ দর্শন ও অভ্যাসের মধ্যে মগ্ন না হওয়াতেই জীব ও ব্রহ্মের একতাবাদকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছেন। এইরূপ চিন্তার মধ্যে আমার কত ভাবের উদয় হইল, হৃদয়ে কত প্রকার উচ্ছ্বাস উঠিল তাহা লিখিতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।

এইরূপ মরুভূমি দিয়া চলিতে চলিতে এক একবার বালুকাময় পাহাড়ের উপর উঠিতেছি আর নামিতেছি। কিন্তু সমতল ভূমি পাইলে উষ্ট্রপরিচালক নিরীহ বাহনকে দৌড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করে। আমার বাহন যখন দৌড়িয়া যায়, তখন বোধ হয় যেন মদমত্ত হস্তীর ন্যায় নাচিতে নাচিতে যাইতেছে! ইহার দৌড়ান ও নৃত্য একই রকম, উভয়ের প্রভেদ বড় বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু উষ্ট্রের দৌড়নে আমার প্রাণান্ত। বাহন যখন খুব দ্রুতগতিতে

চলিতে আরম্ভ করিল তখন বোধ হইল যেন অস্থি হইতে শরীরের মাংস গুলি খসিয়া পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। হৃদয়রাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলি "এ সুখ না দুঃখ?" তিনি বলিলেন "এ সুখও নহে, দুঃখও নহে ; হুকুম মহারাজের।" আমার অন্তরস্থ বুদ্ধ ইহার সাক্ষ্য দিয়া বলিলেন, যত দিন 'আমি' জীবিত থাকিব, তত দিন সুখ দুঃখের বোধ থাকিবে। আমার বিনাশ না হইলে নির্ব্বাণ লাভ হয় না। আমি গেলেই প্রকৃত সম্বোধিরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, তখন অপূর্ব্ব দেব ভাবের বিকাশ হয়, তাহাই বস্তুতঃ নির্ম্মল শুদ্ধ সত্ব।" বাস্তবিক দাস্যযোগে এই আমির বিলোপ হয়। দাসের আর সুখ দুঃখ জ্ঞান কোথায়? আমিত্বের বিনাশ হইলেই দাসত্বের প্রকাশ হয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে সুখ দুঃখের বিসর্জ্জন হইয়াছে। তখন আমার বদন প্রফুল্ল হইল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একা বসিয়া হাসিতে লাগিলাম।

অনন্তর ২৪ মাইল গিয়া বেলা ৮টার পর এক পান্থ-নিবাস পাইলাম। এই সরাইটী গ্রাম হইতে ১ মাইল অন্তর এক মাঠের মধ্যে, আর জন মনুষ্য নাই। বাহন হইতে নামিয়া যেন শরীরটা জুড়াইল, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, উষ্ট্রারোহণের এত মজা তাহা পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলাম না। আমার সাথী একতারা। স্নান করিয়া ভজনে প্রাণ শীতল হইল, সকল দুঃখ অবসান হইল। আমার উষ্ট্রপরিচালক

আবার জাতিতে ব্রাহ্মণ, তিনি আমার জন্য রুটী তৈয়ার করিয়া আনিলেন। জোয়ারের রুটি কথন জীবনে খাইনি, তাহা সুখী বাঙ্গালীর রুচিবে কেন? দুই এক টুকরা খাইয়া শেষ করিলাম। এই রুটি খাইতে গিয়া আমার গাল ছড়িয়া গেল, ভাবিলাম নাহক রক্তপাত কেন করি। আজ রাম-লীলার শেষ দিন; উষ্ট্রপরিচালক ঐ প্রান্তরস্থিত প্রকাণ্ড পান্থনিবাসে আমায় একা রাখিয়া অনায়াসে রামলীলা দেখিতে গেল। আমি আর একা বসিয়া কি করি? আত্মারামের লীলা দেখিতে লাগিলাম। কত দেখিব? একবার বসি একবার শুই, একবার প্রণারাম একতারা লইয়া মনের আনন্দে পাগলের মত ভজন করি। পরে রাত্রি ৮ টার সময় আমার বাহনপরিচালক আসিলেন। কি আশ্চর্য্য ব্রিটিশ সিংহের প্রতাপ! এই অপরিচিত স্থানে কোন প্রকার চৌর্য্য বা দস্যুর ভয় নাই। এ দেশের লোকে ইংরাজদের শাসনে থরহরি কাঁপে। ব্রিটিশ শক্তি ঐশী শক্তির এক অন্যতর পরিচয়। সচেতন মানবরাজ্যে ইহা ভগবানের এক অপূর্ব্ব লীলা। আমায় কেহ কিছু বলে না, বরং একজন আসিয়া আমার সর্ব্ব শরীর টিপিতে লাগিল।

এই ব্যাপারে প্রথমে আমার হাসি পাইল, পরে কাঁদিয়া ফেলিলাম। বলিলাম ঠাকুর! উটের উপর চড়িয়া শরীর বড় বেদনা হইয়াছে তাই বুঝি সেবা করিতে এলে? এমন

ব্যথার ব্যথী, দিল দরদী আরত দেখি নাই। হৃদয়টা বড় বিগলিত হইল, প্রাণটা অস্থির হইয়া পড়িল। অনন্তর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে জলযোগ করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় চলিতে আরম্ভ করিলাম। একে আকাশে সারদীয় চন্দ্রমার সুশীতল চন্দ্রিকা তাহাতে নীচে শুভ্র বালুরাশি; সব যেন হাসিতেছে। উভয়ে মিশিয়া দ্বিগুণ শোভা প্রকাশ করিতেছে। ভাবিলাম চন্দ্র এত সুন্দর কেন? উহার ত নিজের আমিত্ব নাই, আর এক জনের শোভায় ও জ্যোতিতে এত সৌন্দর্য্য। আমার চিদানন্দের প্রেমচন্দ্রিকা ভক্তহৃদয়াকাশে পড়িলে তাহার বেশী-শোভা। এই জন্য ভক্তের এত আদর। এই নিগূঢ় প্রেমযোগ। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ৩০ মাইল গিয়া বালুর মধ্যে কয়েক খানা ঘর দেখিয়া সেখানে অবতরণ করা গেল। এক গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় লওয়া গেল। স্নানাদি করিয়া যখন একতারা লইয়া উপাসনার্থ বসিলাম তখন পাড়ার চারি দিক হইতে মেয়ে ছেলে আসিয়া ঘেরিয়া বসিল। আমি মধ্যে মধ্যে তাহাদের অনুরোধে হিন্দিতে দুই চারিটা ভজন গান করিতে লাগিলাম। উপাসনান্তে উঠিলে সকলে আসিয়া ঢিপ ঢিপ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিল। এ দেশের মেয়েদের সাধুভক্তি অত্যন্ত প্রবল। পূর্ব্ব দিবস সমস্ত দিনের অনাহারে অনিদ্রায় শরীর ক্লান্ত ছিল একটু গড়াইয়া লইলাম, বাড়ীর

গৃহিণী বিশেষ ভক্তির সহিত সেবা করিতে ইচ্ছা করিলেন। আমার সঙ্গে চাউল ছিল তাহা দিয়া বলিলাম ভাত আর তরকারি রাঁধ। তাঁহারা সকলে অতিশয় যত্নের সহিত আহার প্রস্তুত করিয়া দিলেন, আমি ভক্তির সহিত তাহা খাইয়া শরীরটা ঠাণ্ডা করিলাম। পরে আবার রজনীতে চলিতে আরম্ভ করিয়া পর দিন ৮ টার সময় এক বালুময় পাহাড়ের উপর এক গ্রামে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। তথায় এক ঘর দোকানী আছে তাহার ঘরে গিয়া বসিলাম। সেখানে স্নান করিলাম বালিতে। কাপড়ে বালি, শরীরে বালি। জল বালুময়। উপাসনান্তে আহারাদি করিয়া বসিয়া আছি এমন সময় এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসিয়া বসিলেন, দুই একটী ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দুই একটী ভজনও শুনাইলাম। পরে যত যুবতী স্ত্রীলোক ও কয়েক জন পুরুষ আসিয়া ঘেরিয়া বসিল। এক ঈশ্বরকে ডাকিতে বলিলাম, তাঁহাদিগকে কেবল প্রার্থনা ও ভক্তির কথা বলিলাম। তাহা শুনিয়া সকলে আসিয়া পা ধরিল। কেহ বলে আমায় এক নাম দেও, কেহ বলে আমায় মন্ত্র দেও। আমিত বিষম বিপদে পড়িলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মের লম্বা উপাসনা ও প্রার্থনা ত সামান্য নহে, কি করি ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া দুই একটি নাম ও দুই চারিটী কথায় প্রার্থনা বলিলাম। পরে কেহ দুধ আনিতে যায়, কেহ বা মিছরি লইয়া আসে।

আমিত বিষম বিভ্রাট দেখিয়া সরিয়া পড়িবার চেষ্টা দেখি-তেছি, এমন সময় এক দল স্ত্রীলোক আসিয়া পড়িল। কেহ বলে আমার হাত দেখ, কেহ বলে ছেলে হবে কি—না? এইরূপ গোলযোগ দেখিয়া আমি বেলা থাকিতে থাকিতে সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম। রাত্রি ১০টার পর এক গ্রাম পাওয়া গেল তথায় বিশ্রাম করা গেল। বেশ নিদ্রাটি হইল। প্রাতে উঠিয়া চলিতে চলিতে অবশেষে —টার সময় প্রবল স্রোতঃস্বতী সিন্ধুনদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলাম। তখন আমার উষ্ট্রেরও নৃত্য থামিল, আমার চিন্তাতরঙ্গ সিন্ধুর প্রবল তরঙ্গের সঙ্গে মিশিয়া গেল, আমারও প্রাণ জুড়াইল।”

ডেরাস্মাইল খাঁ হইতে ভাই অঘোরনাথ তাঁহার এক জন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন “এখানেও মহাব্যাপার হইয়াছে। নববিধানের মাহাত্ম্য অতি অপূর্ব্ব! এক মহাপণ্ডিত নবী ও রসুল আসিয়াছে, এরূপ লোক আর এ দেশে আসে নাই, এই জনরব পাঠান, মুসলমান, পণ্ডিত, ফকীর, ভক্ত-ধর্ম্ম, শালার ভাই প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোক প্রতি দিনের বক্তৃতায় উপস্থিত হন; নববিধানের কথা শুনিয়া সকলেই বলে এমন মধুর ভক্তি প্রেমতত্ত্ব শুনি নাই। এ প্রকার আন্দোলন আর কোথাও দেখা যায় না। কেহ আর— হইতে পারে না। সকলেই বলে এই —আমার প্রকৃত ধর্ম্ম।

দেরাগাজিখাঁর বিবরণ এইরূপ লিখিয়াছিলেন;—

"সিন্ধু নদের পরপারে ডেরাগাজিখাঁ সংস্থাপিত। সিন্ধুপারস্থ প্রদেশে শিখ ধর্ম্মের তত প্রাদুর্ভাব নাই, এখানে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বিগ্রহাদি সেবার বড় আধিপত্য। বড় গোঁসাঞীদের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদের ভয়ে সকলে জড়সড়!" আমাদের প্রচারক ভ্রাতা তথাকার ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। উহার প্রধান মহন্ত ভাই তাঁহার যৎপরোনাস্তি সেবা করিয়াছিলেন। ঐ ধরমশালাতেই পাঁচ দিন বক্তৃতা হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ঈশ্বরদর্শন, নববিধান ও ভক্তি, ভক্তির মধুরতা, প্রেম ও বৈরাগ্য বক্তৃতার বিষয় ছিল। যে দিন ভক্তি বিষয়ে বলা হয়, সে দিন বড় ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছিল। বক্তা ও শ্রোতা সকলেই ভাবে মগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে এক জন বৃদ্ধ হিন্দু আমাদের ভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আপন আলয়ে লইয়া যান। এই ব্যক্তি সংস্কৃত জানেন, ধর্ম্মচর্চ্চাও করিয়া থাকেন, ইহাঁর এক ভগিনীও সংস্কৃত জানেন ও বেদান্ত পড়িয়া অদ্বৈতবাদের প্রতি অনুরাগিণী। উভয়ে আমাদের ভ্রাতাকে নিজ গৃহে পাইয়া অনেক ভক্তির কথা শ্রবণ করেন। শেষে বৃদ্ধ বলেন, আমি আপনার পদধৌত করিয়া দিব। এই বলিয়া জল আনিয়া উপস্থিত করিলেন এবং হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আবার বলিলেন, আমিত এমন ভক্তির কথা কখন শুনি নাই, আপনাকেত আর পাইব না, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেই

হইবে। ভ্রাতা বিষম বিপদে পড়িলেন। কোনরূপে অব্যাহতি পাইলেন না। নিতান্ত বিনীত হইয়া ঈশ্বরের পানে দৃষ্টি রাখিয়া কোনরূপে কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এখায় একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে। এখানে তিন জন সভ্য নববিধান গ্রহণ করিয়াছেন। আর সকলে এত সাহসী নহেন। আমাদের ভ্রাতা যেখানে গিয়াছেন সর্ব্বত্র নববিধান গৃহীত হইয়াছে। আসিবার দিন এখানকার প্রধান লোকেরা ও ধর্ম্মশালার মহন্ত তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য সিন্ধু নদের পরপারে আসিয়াছিলেন। সকলে আর কিছুতেই ছাড়ে না। শেষে নৌকার উপর ভক্তি ও ব্রহ্মদর্শনের কথা হয়। তাহার মধ্যে এক জন এম, এ, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর মধুর কথা শুনিয়া বিগলিত হইয়া গেলেন। ভক্তিতে গদগদ হইয়া ভ্রাতার পদ চুম্বন করিতে লাগিলেন, অশ্রুপাতের সহিত দুঃখে বিদায় দিলেন।"

তদনন্তর পশ্চিম সীমা হইতে অঘোরনাথ ক্রমে স্বদেশাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। উষ্ট্রের উপর আরূঢ় হইয়া শত শত ক্রোশ মরুভূমি অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নহে। এইরূপ পথকষ্টে বহুমূত্রের পীড়া বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। ঐরূপ কোন উৎকট ব্যাধি তাঁহার ছিল পূর্ব্বে প্রায় তাহা কেহ জানিত না, সামান্য আকারে উহা ছিল, এবারকার পরিশ্রমে কিছু প্রবল হইয়া উঠে। পরলোক গমনের দুই মাস পূর্ব্বে রোগ বৃদ্ধি অনুভব করিয়াছিলেন।

নিতান্ত শয্যাগত না হইলে আর তিনি রোগের কথা কাহাকে বলিতেন না। শাক্য সিংহের জীবনচরিত লিখিয়া মাঘোৎসবের মধ্যে তাহা মুদ্রিত করিবেন ইচ্ছা ছিল, সেই জন্য শীঘ্র কলিকাতা আসিতে সঙ্কল্প করেন। লক্ষ্ণৌ পৌঁছিবার অল্পকাল পূর্ব্বে লাহোর হইতে আপনার সহধর্ম্মিণীকে এইরূপ পত্র লিখেন;—"আমি এক মাসের মধ্যে কলিকাতায় গিয়া পৌঁছিব মানস আছে, এখন ভগবান্ কি করেন। দাসের আর কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। যে তাঁহার কাছে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে সে কি করিবে?" লক্ষ্ণৌ নগরে অগ্রজের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পত্নীবিয়োগ শোক সান্ত্বনা করিবার মানসে তথায় গেলেন, গিয়া ভ্রাতার হৃদয়ে বিষম শোকানল প্রজ্বলিত করিলেন। এক হপ্তা মাত্র তথায় স্থিতি করেন। তথায় পৌঁছিয়া বন্ধুদিগকে শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা বলেন, তদনুসারে চিকিৎসা আরম্ভ হয়। যে প্রকার পরিশ্রম এবং উৎসাহে তিনি সর্ব্বদা দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া কেহ মনে করিতে পারেন নাই যে এত শীঘ্র হঠাৎ পীড়া বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য উহা সাংঘাতিক পীড়া বলিয়া কাহারো মনে হয় নাই। পীড়া বৃদ্ধি এবং মৃত্যুর আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত তত্রত্য কোন বন্ধু এইরূপ লিখিয়াছেন।

"৩০ শে নবেম্বর বুধবার সন্ধ্যার সময় মহাত্মা অঘোরনাথ লক্ষ্ণৌ নগরে আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কিঞ্চিৎ

অসুস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু সাধু মহাত্মারা যতক্ষণ সামর্থ্য থাকে, পরম পিতার আদেশ পালন করিতে আলস্য প্রকাশ করেন না। তিনি নিজ ভ্রাতার ভবনে আসিয়াই একটি ব্রাহ্ম পীড়িত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং সেখানে ধর্ম্মালোচনা করিয়া পীড়িত ব্যক্তির মনে শান্তি দান করিলেন। পর দিন প্রাতে এক ব্রাহ্মের বাটীতে একত্র উপাসনা করেন। ঈশ্বর সকল সান্ত্বনা ও শান্তি এই বিষয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আহারের পর লক্ষ্ণৌস্থ সমস্ত ব্রাহ্মগণকে একত্র করিয়া উপাসনা করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। এবাটী ওর বাটী ঘুরিতে লাগিলেন। আমি নিরূপিত স্থানে সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইয়াছিলাম। দেখিলাম, কিছুক্ষণ পরে তিনি সেই স্থানে আসিলেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত হন নাই, এই জন্য দুঃখিত হইয়া উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের সহিত মফস্বলের ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। সেই কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহার মুখ হইতে যে কয়েকটী কথা বিনিঃসৃত হইয়াছিল তাহা এখনও আমার হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে। কথাগুলি সরলতা উদারতা এবং মধুরতাতে পূর্ণ, যাহা দ্বারা প্রকাশ পায়, যে ইনি সে প্রকৃতির ব্রাহ্ম ছিলেন না, যাহারা মানুষের দোষ দেখিয়া তাহাকে ঘৃণা করে। মফস্বলে দুর্ব্বলমনা যজ্ঞোপবীতত্যাগী ব্রাহ্মেরা পুত্র কন্যার বিবাহের সময় সূত্রধারী ব্রাহ্মণ হন।

এই বিষয়ের কথা উত্থাপিত হইলে, এক জনকে কিঞ্চিৎ ঘৃণাসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করেন এবং এমনি ভাবে কথাগুলি বলিলেন, তাঁহাতে বিবেচনা হইল যেন তিনিই সেই পাপ করিয়াছিলেন, সেই পাপের জন্য যেন তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে। অন্য এক সময়ে ঐ বিষয়েরই কথা উত্থাপিত হইলে একজনকে উপহাস করিতে শুনিয়া বলেন "দেখ ধর্ম্মবিষয়ে উপহাস করিও না। যাহার যতটুকু সামর্থ্য সে ততটুকু ঈশ্বরের পথে চলিবে। কেহ আপন সামর্থ্যাতীত কার্য্য করিতে পারিল না বলিয়া তাহাকে উপহাস করা ভাল নয়। বরং তাহার জন্য দুঃখিত হও এবং তাহাকে সৎপথে আনিবার চেষ্টা কর।" সেই সন্ধ্যার উপাসনাতে এই শিক্ষা দিলেন, যে হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিলে পুত্র কন্যার বিবাহের জন্য কাহাকেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় না। এই সন্ধ্যার সময় তাঁহার মুখ হইতে আর একটী কথা বাহির হইয়াছিল যাহার দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিল যে যথার্থ উপাসনা কি ইহা সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ আমাদের আচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে। যদ্যপি অন্য কিসেরও জন্য ব্রাহ্মসমাজ আচার্য্য মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়, নিদান এই জন্য হওয়া উচিত। পর দিন প্রাতে তাঁহার ভ্রাতা ভুবনমোহন রায়ের বাটীতে একত্র উপাসনা হয়। আমি সেই দিনেই তাঁহার উপাসনার সার

লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। যাঁহাদিগের হৃদয় তাঁহার বিরহে কাতর হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহার জন্য অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন তাঁহারা যদি সেই উপাসনাটী পাঠ করেন তাঁহা হইলে অনেক সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন। মহাত্মা অঘোরনাথের বন্ধুগণ, আপনারা ব্যাকুল হইবেন না, আপনাদিগের অঘোরনাথ মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আপনাদের জন্য সান্ত্বনা বাক্য রাখিয়া গিয়াছেন, সেই দিনকার প্রার্থনাটী আমার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

সন ১২৮৮ সাল তাং ১৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার—"হে প্রভু, আমরা কেন সংসারে মজিয়া পিঞ্জরে বদ্ধ থাকি? পিঞ্জরের পাখী কেন পিঞ্জর হইতে বাহির হয় না? পিঞ্জরে থাকিলে তো দুঃখ ভিন্ন সুখ কিছুই নাই। কিসে ছেলে পিলের লেখা পড়া হবে, কে তাহাদিগকে লালন পালন করিবে, এ সমস্ত আমরা কেন ভাবিয়া মরি? কেন আমরা তোমার উপর সে সমস্ত ভার দিয়া নিজেরা তোমার যোগানন্দে মগ্ন থাকি না? এবং তোমার আদেশ পালন করি না? আমরা আপনার উপর ও সকলের ভার লইয়া কি করিতে পারি? লাভের মধ্যে মায়াজালে বদ্ধ হইয়া মারা যাই। আজ ঐ বন্ধু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আজ অমুক ভাই চলিয়া গেল, আজ স্ত্রী গেল, আজ স্বামী গেল, এ সমুদায় ভাবিয়া ভাবিয়া শোকে বিহ্বল হই। তাই তোমাকে ডাকি প্রভু, তুমি পিঞ্জর ভগ্ন করিয়া দাও। সংসারে থাকিলে তো ক্ষতি

নাই, কিন্তু পিঞ্জরে যেন না থাকি। সমস্ত ভার গৃহলক্ষ্মী তোমার উপর দিয়া নিজে যেন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। যাঁহাদিগকে তুমি লইয়া যাইতেছ। তাঁহাদের জন্য আমাদের শোক করে কি হবে? তাঁহারা যে কোথাও যান নাই। তাঁহারা যে সকলে তোমার মধ্যে আছেন। যখন তোমাকে ধ্যান করি, তখন যে সব পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগকে তোমার মধ্যে দেখিতে পাই। আমরাও যখন এ পৃথিবী হইতে যাইব, তখন সেই পূর্ব্বের মত তাঁহাদিগের সহিত একত্র থাকিব এবং তোমার সহিত যোগানন্দ সম্ভোগ করিব। তাই বলি মা, আমাদিগকে পৃথিবীর সমস্ত বিপদের মধ্যে নির্ব্বিকার করিয়া দাও। আমরা যেন সকল সময়েই তোমার উপর নির্ভর করিতে পারি, তোমার শ্রীচরণে এই আমাদের অদ্যকার বিনীত প্রার্থনা।

মহাশয়, এই প্রার্থনাটী এবং অন্য দিনের প্রার্থনাতে বিবেচনা হয় তিনি মৃত্যু আসন্ন জানিতে পারিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক একটি ব্রাহ্মণ আমাদিগকে বলিয়াছেন, অঘোর বাবু মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এবার বোধ হয় আর কলিকাতায় যাইতেছি না। যাহা হউক, এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক যে,তিনি এ পর্য্যন্ত বিশেষ কাহিল হন নাই, যেমন পরিশ্রম করিতেছিলেন তাহাতে বিবেচনা হয় না যে তিনি পীড়িত। এই তারিখেই (১৮ই অগ্রহায়ণে) সমাজে উপাসনা করেন; "ঈশ্বরেতেই মিলন"

এই বিষয়ে উপদেশ হয়। পর দিন প্রাতে বিশ্বনাথ বাবুর বাটীতে এবং সায়ংকালে যোগেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপাসনা করেন। বিশেষ কোন শরীরে অসুখ ছিল না। পরদিন রবিবার প্রাতে গোপাল বাবুর বাটীতে উপাসনা করেন, সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে উপাসনা করেন। মন্দিরে এই তাঁহার শেষ উপাসনা, বেদীতে এই তাঁহার শেষ অধিরোহণ, এবং যে সমস্ত কথা তিনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা যেন এই শেষ ভাবিয়াই করিয়াছিলেন। উপদেশের সময় বলিলেন, আমি এই জীবনে অনেক শিখিয়াছি, আমার বলিবার অনেক আছে, কিন্তু যাহা সর্ব্ব প্রধান শিক্ষা তাহাই আজ তোমাদিগকে বলিতেছি। পৃথিবীতে প্রকৃত পথ কি? ঈশ্বরের উপর জীবনের সমস্ত ভার অর্পণ করাই প্রকৃত পথ, নির্ম্মলা ভক্তির পথই প্রকৃত পথ। উপদেশের শেষে প্রার্থনার সময় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহা আমি এখন যত ভাবিতেছি ততই আমার আশ্চর্য্য বৃদ্ধি হইতেছে। সেই কয়েকটী কথার মূল উপদেশের সঙ্গে কি সম্বন্ধ আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই এখনও বুঝিতেছি না, কিন্তু আমার এটী বেশ মনে আছে, উপাসনার শেষে এই কয়েকটি কথা বলেন;—"মা আমার স্ত্রী পুত্রের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারি নাই, তাহারা যে কাল কি খাইবে তাহার উপায় নাই। মা, আমি তোমার উপরেই তাহাদের ভার দিয়া রাখিয়াছি! আমি যে কিছুই করি

নাই তা নয়, এবং যদি জীবনকে কেহ ধন বলে তবে পর-বংশীয়দের জন্য এই জীবনটি রাখিয়া গেলাম। শেষ পর্য্যন্ত এই জীবনকে কলঙ্কিত হইতে দিও না।" এই কথাগুলি মহাত্মা অঘোরনাথ আরও মরধুভাবে বলিয়াছিলেন, আমার যত দূর মনে ছিল লিখিলাম।

পর দিন প্রাতে তিনি জোলাপ লইয়াছিলেন। একজন ডাক্তার তাঁহাকে এই বিষয় উপদেশ দেন। সেই ডাক্তারই তাঁহার মূত্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। জোলাপ লইয়া কিঞ্চিৎ কাহিল হইয়া পড়িলেন তথাপি আমাদের সকলকে লইয়া নিয়মিত উপাসনা করিতে ছাড়িলেন না। সে দিনের প্রার্থনাও কেবল মাত্র নির্ম্মলা ভক্তির জন্য ছিল। প্রার্থনা অতি সুন্দর,আমি লিখিয়া রাখিয়াছি। এখানে উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক নাই এই জন্য লিখিলাম না। ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন তথাপি দুর্ব্বলতা গেল না, বরঞ্চ দিন দিন বেশী দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। ২২ শে অগ্রহায়ণ ৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার আমরা তাঁহার সহিত উপাসনা করিলাম। এই তাঁহার শেষ একত্রে উপাসনা। প্রার্থনাটী লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে জগৎজননি! আমার শরীর রুগ্ন হলে আত্মার কি? আমার শরীর কষ্ট পাচ্ছে বটে, কিন্তু মনতো সেই আনন্দই ভোগ কচ্ছে। মা আশীর্ব্বাদ কর যেন এইরূপে কি সুস্থাবস্থা কি অসুস্থ অবস্থা সকল সময়েই তোমার প্রেমসুধা পান

করিতে পারি। দেখ মা, আমি যেন তোমার মধুময় বাক্য শ্রবণ করিতে এবং তোমার মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিতে কখন শ্রান্ত না হই। মা, আমি সুস্থতাও চাহি না, অসুস্থতাও চাহি না, আমি কেবল তোমাকে চাই। মা যখন রোগে আমার শরীর কষ্ট পাচ্ছে তখন আমি দেখছি তুমি আমার কত শুশ্রূষা কচ্ছ। আমার রাত্রে নিদ্রা হয় না এতে আমার কত কষ্ট হতো যদি তুমি আমার কাছে না থাকিতে। কিন্তু তুমি আমার কাছে দিবা রাত্র আছ এই জন্য আমার কোন কষ্টই কষ্ট বলে বোধ হয় না। মা এই ভাবে আমাকে চিরদিন সঙ্গের সাথি করিয়া রাখ।”

৭ ই ডিসেম্বর ২৩ শে অগ্রহায়ণ বুধবার দৌর্ব্বল্য হইয়াছিল, তথাপি যথানিয়মে প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু এ দিনে আর স্থির হইয়া বসিতে পারিলেন না, শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। এমন যে সদাসর্ব্বদা বিছানায় ছিলেন তাহা নয়। কখনও চেয়ারে এবং কখনও শয্যায় ছিলেন। পূর্ব্বের মত ভদ্রলোকের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপও করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমাকে ঋগ্বেদের সাতটি শ্লোক বুঝাইয়া দিলেন এবং যোগতত্ত্বের বিষয় কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিলেন। রাত্রি সেইরূপ দুর্ব্বল অবস্থাতেই গেল। মুখশ্রী খারাপ হয় নাই, শরীরও দুর্ব্বল বলিয়া বিবেচনা হয় নাই।

পর দিন প্রাতে আবশ্যক কার্য্যে নীচের তলায় আপনি গেলেন, কিন্তু কাহারও সাহায্য ব্যতীত উঠিয়া আসিতে

পারিলেন না। নীচে হইতে আসিয়া যেমন শয্যায় শয়ন করিলেন অমনি হাত পা শীতল হইয়া গেল, নাড়ী ছাড়িয়া গেল। ডাক্তারেরা অনেক কষ্টে দুই প্রহরের সময় শরীর গরম করিয়া আনিয়াছিলেন, কিন্তু সেই গরম সন্ধ্যার পর পুনরায় যে শীতল হইতে আরম্ভ হইল আর থামিল না। রাত্রি আন্দাজ ২—২০ দুইটা বিশ মিনিটের সময় প্রাণ বায়ু বাহির হইয়া গেল। মহাত্মা অঘোরনাথের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা কয়েকটী অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছেন যাহা তাঁহারা কখনো ভুলিবেন না। সমস্ত দিন রাত্রির মধ্যে একবারও স্ত্রী কি পুত্রের কথা মুখে আনেন নাই। ভুবন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মনে কিছু চিন্তা হইতেছে? উত্তর করিলেন, না, কিছুই না। জিজ্ঞাসা করিলেন, টেলিগ্রাফ করিতে হইবে? উত্তর করিলেন, না। তাঁহার সেই সময়ের মূর্ত্তি দেখিলেই বিবেচনা হইত যেন অন্তরে প্রগাঢ় শান্তি সম্ভোগ করিতেছেন। যাঁহারা নিকটে ছিলেন তাঁহাদের সহিত বেশি কথা কহেন নাই। কথা কহিতে চাহিলে এরূপ ভাব দেখাইতেন যেন অন্তরের কোন সুখ সম্ভোগের ব্যাঘাত হইতেছে। যিনি অন্তরে হৃদয়নাথকে ভাবিতেছেন তিনি সে সময় পার্থিব মানুষের সহিত কথা কহিবেন কেন? কিন্তু মৃত্যুর সময়ের ব্যাপার আরও অদ্ভুত। প্রায় রাত্রি দুইটার সময় সমস্ত শরীর শীতল হইয়া গেল। হাত পা বার কয়েক ছুড়িলেন, চক্ষু

উল্টাইয়া চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তারেরা বলিলেন, হইয়া গিয়াছে, গাত্র আবৃত করিয়া দাও। কিন্তু আশ্চর্য্য, হস্ত পদ ছড়ান ছিল, আপনি টানিয়া লইলেন। দক্ষিণ হস্তটি বক্ষের উপর আনিলেন, বৃদ্ধাঙ্গুলি বক্ষে রাখিয়া আর চার অঙ্গুলি তাহার উপরে এবং বাম হস্তটি শরীরের পার্শ্বে লম্বায়িত রাখিলেন, চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিলেন, মুখটি এমনি ভাবে রাখিলেন যেন ঈশ্বরের দিকে ফিরাইলেন। সে চক্ষু আর খুলিলেন না, সে মুখ আর বাঁকিল না, বক্ষঃস্থল হইতে সে দক্ষিণ হস্ত আর কেহ সরাইতে পারিল না, মহাযোগী ধ্যান করিতে করিতে পিতার নিকট চলিয়া গেলেন। পৃথিবীতে এত কষ্ট স্বীকার, ত্যাগস্বীকার, পর্ব্বতে বনে পরিভ্রমণ, কিছু দিনের জন্য সামান্য গেঁদাফুল খাইয়া জীবন ধারণ, সমস্ত সফল হইল। পৃথিবীতে থাকিয়া স্বর্গ ভোগ আর কাহাকে বলে? এইরূপে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রশান্তভাবে সকল দুঃখ সহ্য করিয়া পরমাত্মাতে আত্মার যোগসাধনই স্বর্গভোগ। এই স্বর্গভোগ যাঁহারা করিতেছেন ইহ জীবনে তাঁহারাই এইরূপ নির্ব্বিকার চিত্তে পিতৃভবনে যাইতে পারিবেন।

নিশা অবসান প্রায়, বিশ্বনাথ বাবু আসিলেন, উপাসনা শেষ হইল। সে উপাসনাতে যে ক্রন্দনের রোল উঠিল তাহা ঈশ্বর প্রেমের ক্রন্দন, কেহই শোকের কান্না কাঁদেন নাই। যোগীকে যোগানন্দে ভাসিতে ভাসিতে স্বর্গারোহণ

করিতে দেখিয়া কে আর শোক করিবে? ৫ টার সময় শব লইয়া নিস্তব্ধ গগনকে হরিধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে আমরা গোমতী অভিমুখে চলিলাম। দুই দিকে প্রভাত হইল। একদিকে মহাত্মা অঘোরনাথের স্বর্গ-ভোগের প্রভাত হইল, অন্য দিকে দিবাও প্রভাত হইল। অথবা ইহাই বা বলিব কেন? মহাত্মা যে পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতেই স্বর্গভোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন।

যখন নদীতটে যাইয়া শবের আবরণ খোলা হইল, তখন হিন্দুবাহকগণ এবং নিকটস্থ দর্শকমণ্ডলী মহাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন আকার দেখিয়া সকলে "ধন্য পুরুষ" "ধন্য পুরুষ" বলিতে লাগিল। দাহ কার্য্য ৯॥০ সাড়ে নয়টার সময় সম্পন্ন হয়।"

ভাই অঘোরনাথ ধর্ম্মযৌবনের পূর্ণ উদ্যমে আত্মীয় বন্ধুদিগকে শোকে নিমগ্ন করিয়া চলিয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য মধ্যগগনে সুতীব্র কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে অস্তমিত হইল, শোকের ঘন অন্ধকার সহযোগী ধর্ম্মবন্ধুগণের মুখকে আচ্ছন্ন করিল। উৎসবের সময় কোথায় তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আমরা শীতল হইব আশা করিতেছি, না একেবারে মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। এই দেখিলাম তেজস্বী যুবাপুরুষ জয়পতাকা হস্তে লইয়া বিধান রঙ্গভূমিতে গাই-তেছে, নাচিতেছে, আপনি কাঁদিয়া লোকদিগকে কাঁদাই-তেছে; দেখিতে দেখিতে হায় সে মূর্ত্তি কোথায় চলিয়া গেল!

প্রিয় বন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা আলোচিত হইল তাহা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হয়, তাঁহার জীবন একখানি জমাট অচ্ছিদ্র অখণ্ড পদার্থ ছিল। আলস্য, বৃথা কল্পনা, পাপচিন্তা প্রবেশের দ্বার তিনি একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। নববিধান-বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাতে কেমন ফলোপধায়ী হইয়াছিল, তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। একাধারে এত সদ্গুণ এবং ক্ষমতা অতি বিরল দৃশ্য সন্দেহ নাই। তিনি এক সময়ে এক জীবনে ধর্ম্ম সাধনও করিয়াছেন এবং জগতের কল্যাণোদ্দেশে তাহা বিবিধ আকারে প্রচারও করিয়াছেন। এক দিকে রাজনীতি ধর্ম্মনীতি, সমাজসংস্কার বিষয়ে পুস্তক পত্রিকাদি প্রণয়ন দ্বারা প্রচার কার্য্যে অর্থানুকূল্য করা, অপর দিকে যোগ ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান শিখাইয়া মনুষ্যমণ্ডলীকে স্বর্গের পথে লইয়া যাওয়া, তাহার সঙ্গে নিজের সাধন ভজন, এই ত্রিবিধ কার্য্য এক সঙ্গে চলিয়াছে। সৎশিক্ষা এবং সদ্দৃষ্টান্ত উভয়ই তাঁহাতে চিরদিন বিদ্যমান ছিল। যখন যে দেশে গিয়াছেন তখন সেই সেই দেশের লোকের মনে ধর্ম্মানুরাগ প্রজ্বলিত করিয়াছেন। কোন স্থানের পরিশ্রম তাঁহার বিফল হয় নাই। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ উপদেশ উপাসনা বক্তৃতা শ্রবণে এবং পবিত্র জীবন দর্শনে ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম এবং অপর ধর্ম্মাবলম্বী সকলেই উপকৃত হইতেন। সর্ব্বান্তঃকরণে সাধন

করিলে নববিধানের ধর্ম্ম যে জীবনে পরিণত হইতে পারে অঘোরনাথের জীবন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যোগ ভক্তি জ্ঞান এবং সৎকর্ম্ম ধর্ম্মের এই চারি বিভাগে তাঁহার সমান উৎসাহ বরাবর ছিল। বিদেশে যখন প্রচার করিতে যাইতেন তখন প্রাতে স্থানীয় ব্রাহ্মগণকে লইয়া দৈনিক উপাসনা করিতেন, মধ্যাহ্নে পুস্তক কিম্বা পত্রিকার জন্য বিবিধ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতেন, সন্ধ্যাকালে ঘরে ঘরে ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিয়া বেড়াইতেন। প্রাচীন হিন্দু হইতে কৃতবিদ্য নব্য দল সকলের নিকটেই তাঁহার গতিবিধি ছিল। স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের ভিতরে অনৈক্য মতভেদ থাকিলে তাহা মিটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। শরীরও যেমন সুস্থ ছিল, আত্মাও তেমনি সবল এবং কর্ম্মক্ষম উৎসাহী। নববিধান ক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে যত প্রকার নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অঘোরনাথ তাহার প্রত্যেক বিষয়ে প্রধান সহায় ছিলেন। ঈশ্বরাদেশ পরিপালনে নির্ম্মল-বিবেকী স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ হইয়াও গুরুজন সন্নিধানে সাধু মহাজনদিগের নিকটে তিনি সর্ব্বদা বিনম্র মৃদুভাবে চলিতেন। এক ব্যক্তিকেই পর্য্যায়ক্রমে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত দেখা গিয়াছে। অঘোরনাথ কখন উপাসনালয়ে বেদীর উপরে, কখন প্রচারকার্য্যালয়ের কর্ম্মচারীর আসনে; কখন রোগীর শয্যাপার্শ্বে, কখন সাধকমণ্ডলীর রন্ধন শালায় পাচকের কার্য্যে; কখন স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে, কখন

বা নির্জ্জন ভজন কুটীরে; সর্ব্বত্রই আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। প্রচারযাত্রায় সম্পাদক হইয়া ভিক্ষারঝুলি হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেন। বিরোধীর বাটীতে গিয়াও উপাসনা করিয়া আসিতেন। টাকা কড়ির হিসাব বোধও ছিল, কোন বিষয়ের কার্য্যভার যতক্ষণ তাঁহার স্কন্ধে থাকিত ততক্ষণ তৎসম্বন্ধীয় হিসাবাদি পরিষ্কার রাখিতেন। যখন যে দেশে গমন করিতেন, তথাকার ইতিহাস পড়িয়া স্থানীয় সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা লিখিয়া পাঠাইতেন। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস যাবৎ বিষয়েই তাঁহার রুচি ও অনুরাগ ছিল। যে সকল ক্ষমতা থাকিলে পৃথিবীতে যশস্বী এবং প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়া যায় তাদৃশ কোন অসাধারণ প্রতিভাশক্তি তাঁহার ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাতে বহুবিধ সদ্গুণের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইয়াছে। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যে তিনি উচ্চ আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের অবিশ্বাস ধর্ম্মান্ধতা, নাস্তিকতা এবং পৌত্তলিকতার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে অঘোরনাথের মহত্ত্ব সহজেই প্রতিপন্ন হয়। যোগ ভক্তি বৈরাগ্য বিষয়ে স্বভাবতঃ অনুরাগ থাকাতে তিনি হিন্দু শাস্ত্রের ঐ সমস্ত ভাব সহজে উপলব্ধি করিতে পারিতেন। গীতা যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। বাল্যাবধি শেষ দিন পর্য্যন্ত কোন দিন কেহ তাঁহাকে অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখে নাই। ফলতঃ বালক কাল

হইতে তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল। প্রচারকমণ্ডলী মধ্যে বিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি একত্র সকলের সঙ্গে ছিলেন, বহুবিধ কার্য্য করিতেন, কিন্তু রাগ করিয়া কটু কথা বলিতে কদাচ কেহ শুনেন নাই। শান্ত গম্ভীর ধীর মিতাচারী এবং মিতাহারী হইয়া তিনি সাধারণতঃ প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে রজনী দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। সভা হইতে যখন যে কার্য্যের ভার তাঁহাকে দেওয়া হইত তাহা অপরাজিত চিত্তে বহন করিতেন। চিত্তের প্রসন্নতা এবং শান্তি প্রায় তাঁহাকে কোন দিন পরিত্যাগ করে নাই। যখন যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেন তখন সকলের অগ্রে নিদ্রা হইতে উঠিতেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, কখন কখন ১। ২ দুইটার সময়ে শয়ন করিয়াও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে জাগিতেন। ক্ষণকাল স্মরণ মনন ধ্যান চিন্তার পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জীবনের ব্রত সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন। ইহার ভিতর গৃহকার্য্য, লেখা পড়ার চর্চ্চা, প্রচার, সাধন, ভজন, সৎপ্রসঙ্গ সাধু সঙ্গ সমস্ত নির্ব্বাহিত হইত। নিদ্রা তাঁহার এমনি আয়ত্ত ছিল, যে যেখানে সেখানে অগাধ নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িতেন। তাঁহার দ্বারা বর্ষে বর্ষে ধর্ম্মরাজ্যের সীমা বিস্তৃত হইত। ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কাহাকেও তিনি অব্যাহতি দিতেন না, যাহাতে আধ্যাত্মিক গভীরতা জন্মে তদ্বিষয়ে সমধিক চেষ্টা করিতেন। অর্দ্ধানুরাগী ব্রাহ্মদি-

গকে পূর্ণানুরাগী উপাসনাশীল করিবার পক্ষে তাঁহার সর্ব্বদা যত্ন ছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে এমন ভক্তিমান্ সাধক ব্রাহ্ম অল্পই আছেন, যিনি এই মহাত্মার সহবাসে সুখী এবং ইহাঁর সাধু জীবন হইতে উপকৃত না হইয়াছেন। বেহার প্রবাসী কোন বন্ধু তাঁহার সম্বন্ধে এই কয়েকটী ঘটনা লিখিয়া দিয়াছেন ;—

“মতিহারী বঙ্গদেশের উত্তর সীমায়। প্রচারার্থে এ দেশে আর কেহ পূর্ব্বে গমন করেন নাই। সাধু অঘোর নাথের সরল ও নিঃস্বার্থ ভাবে সকলেই মোহিত হইয়াছিলেন। এক জন ভদ্রকুলকন্যা সাধু অঘোর নাথের ব্যবহারের জন্য একখানি নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় প্রেরণ করিয়াছিলেন। বৈরাগী অঘোর নাথ বস্ত্র পাইয়া একটু হাসিলেন ও বলিলেন আমার তো বস্ত্র আছে; ব্যবহারোপযোগী ৪ খানি বস্ত্র আছে, আর লইব না। এই বলিয়া বস্ত্র ফিরাইয়া দিলেন।

সংসারী অঘোর নাথ এইখানে (আরা) থাকিয়া কি করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে হয় দেখাইয়া গিয়াছেন। নিজে বাজার হইতে কাষ্ঠ ও চাউল ক্রয় করিয়া আনিতেন। স্বয়ং পীড়িত সন্তানের ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া ঔষধ লাগাইয়া দিতেন। ভিখারীদিগকে দান করিতে হইবে, স্বর্ণ রৌপ্য অভাবে কপর্দ্দক দান করিয়া দয়া বৃত্তি চরিতার্থ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের

বৃদ্ধাঙ্গুলীতে আঙ্গুলহারা হয়। এক জন বন্ধু বলিলেন, অসুখ নিবারণের নিমিত্ত কিছু করুন। সাধু অঘোরনাথ সহিষ্ণুতা গুণে ভূষিত ছিলেন, তিনি বলিলেন অমনি সারিয়া যাইবে। যথার্থ ই দুই তিন দিনের মধ্যে আরোগ্য হইয়া গেল।

প্রচারার্থে সাধু অঘোর নাথ প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে গয়া গমন করেন, তখন রেলের গাড়ি ছিল না। ৬০ মাইল মেলকার্টে যাইতে হয়। সমস্ত রাত্রি আহার হয় নাই, পিপাসায় অস্থির হইয়া সমাজের সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলেন। সম্পাদকের বাসা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। অন্য এক জন ভদ্রলোকের বাটীতে গেলেন। গৃহস্থেরা সকলেই নিদ্রিত, তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই, এদিকে পিপাসায় অস্থির। সাধু মৃদুস্বরে গৃহস্বামীর নাম ধরিয়া ডাকিলেন। কাহারও উত্তর পাইলেন না, সুতরাং সম্মুখস্থ পুষ্করিণী হইতে অঞ্জলী করিয়া জল পান করিয়া বহির্ভাবে একখানি খালি পাল্কী ছিল, সেই শয্যাবিহীন পাল্কী খানিতে শয়ন করিয়া রহিলেন। কাহাকেও বিরক্ত করিলেন না।

বারান্তরে সেইরূপ একারোহণে গয়ায় উপস্থিত হইয়া স্থানীয় উপাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে একটী শূন্য ঘরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র যোগী শূন্য প্রাচীরের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া

অবিরল ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। স্থানীয় উপাচার্য্য বুঝিতে পারিলেন না কেন সাধু অঘোরনাথ এরূপ ভাবাপন্ন হইলেন।”

সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত, ভক্তি করিত, শত্রু কেহ ছিল না। প্রচারকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এক অমূল্য রত্ন ছিলেন। তাঁহার মত আদরের পাত্র এবং শ্রদ্ধার আস্পদ ব্যক্তি কোথায় না সমাদৃত হইবে? স্বদেশস্থ বিদেশস্থ শত শত ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহানুভূতি এবং শোকসূচক পত্র ইহা সপ্রমাণ করিয়া আমাদিগের বিষাদ আরো ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। তাঁহার সহিত ক্ষণকালের সহবাস কি ফলপ্রদ তাহার আভাস জনৈক শিক্ষিত বন্ধুর পত্র দ্বারায় নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

কৃষ্ণনগর ১৪ই পৌষ। “আমার এ পত্র পাইয়া বিস্মিত হইবেন না। আমি ভাবিয়াছিলাম ব্রাহ্মসমাজের সহিত আমার সম্বন্ধ বহুকাল তিরোহিত হইয়াছে। আজ কত বৎসর হইল কোন ব্রহ্মউপাসনা মন্দিরে প্রবেশ করি নাই, কোন ব্রাহ্মের সহিত মিলিত হই নাই, ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তক বা পত্রিকা গ্রহণ করি নাই। আপনি হয়তো মনে করিবেন আমি ভয়ানক ব্রাহ্ম কিম্বা ব্রহ্মবিদ্বেষী কুপথগামী। জগদীশ্বর জানেন আমি এই উভয় মহাপাপের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে যত্নহীন বা বিফলযত্ন হই নাই।

আমি কেন আপনাকে পত্র লিখিতেছি? না লিখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় তাই লিখিতেছি। অব্যক্ত হৃদয় যন্ত্রণা অনেক সময়ে দুঃসহ এবং কখন কখন অসহনীয়ও হইয়া থাকে। অঘোরনাথ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন আমার তাহাতে কি? তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে যদি বিশাল মনুষ্যসমাজের সহিত আমার কিছু মাত্র সম্পর্ক না থাকিত তথাপিও অঘোরনাথের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি দারুণ মনঃপীড়া প্রাপ্ত হইতাম। ১৪ বৎসর গত হইল তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সে সময় আমি ইহ জীবনে বিস্মৃত হইব না; আমি হৃদয়স্থ ভীষণ অরণ্যমধ্যে পথ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, তিনি চকিতের ন্যায় কোথা হইতে আসিয়া আমার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক পথে তুলিয়া দিয়াছিলেন। আর দুই মাস হইল তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন ষ্টেসনে রজনী প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে আমি রেলওয়ের একটী কক্ষে একাকী বসিয়াছিলাম। ট্রেণ ছাড়িবার সময় নিকট, দলে দলে আরোহী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শকটে প্রবেশ করিতে লাগিল, ঘণ্টা বাজিল ট্রেণ, নড়িয়া উঠিল। দুইটী লোক দ্রুত পদে আমার নিকট দুই একটী শকট কক্ষে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না; আমার কক্ষের সম্মুখে আসিলে আমি দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া যিনি অগ্রসর ছিলেন তাঁহার হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক

উঠাইয়া লইলাম। সে হস্ত ইহ জীবনে আর স্পর্শ করিতে পাইব না। কে জানিত দীর্ঘকাল পরে যে হস্ত স্পর্শ করিয়া আমি আপনাকে পবিত্র মনে করিলাম, সে হস্ত এত শীঘ্র আমাদের সকলের স্পর্শ শক্তি অতিক্রম করিবে। যাঁহার হস্তাকর্ষণ করিয়া আমি টেণে উঠাইলাম তিনি অঘোরনাথ। দর্শনে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। তাঁহার সে প্রোজ্জ্বল অথচ মাধুর্য্যময় মুখমণ্ডলের সম্মুখে আমার হৃদয় প্রণত হইল। প্রায় তিন ঘণ্টা কাল আমি তাঁহার পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়াছিলাম, এ তিন ঘণ্টা আমার বৃথা ব্যয়িত হয় নাই, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মন আশা আনন্দ উৎসাহ ও সাহসপরিপূর্ণ হইতে লাগিল। নববিধানের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তিনি আমার নিকটে ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে একটী ভাব বিশেষ প্রবল ছিল, এখন তাহা স্মরণ করিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি। পরকালের আশা ভরসার কথা তিনি বার বার উল্লেখ করিলেন, একবার কথায় কথায় বলিলেন "আমি ইহকাল পরকালের বিচ্ছিন্নতা দেখিতে পাই না, অনেক সময়ে আমার বোধ হয় আমি এ পৃথিবীতে নাই।" তিনি এ কথা কেন বলিলেন? এত শীঘ্রই যে তাঁহার দেব আত্মা দেহ কারাগার হইতে উন্মুক্ত হইয়া স্বর্গধামে প্রস্থান করিবে তাহা তিনি কি জানিতে পারিয়াছিলেন? ঐ কথাটী বলিবার একটু পরেই তিনি আপন গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলেন ট্রেণ থামিল আমার নিকট

হইতে বিদায় হইলেন, কে জানিত এ বিদায় চির বিদায় হইবে।

সমস্ত ব্রাহ্মজগৎ অঘোরনাথের শোকে বিহ্বল—আমি ব্রাহ্মজগতের এক জন কিনা তাহা জানি না। কিন্তু আমি ব্রাহ্মজগতের নিকটে বিনয়ে প্রার্থনা করি, আপনাদের অশ্রু-জলের সহিত আমাকে আপন অশ্রুজল মিলাইতে দিন। আমাদের বিলাপধ্বনির সহিত আমার কাতরধ্বনি মিলা-ইতে দিন। আমি জানি পরমযোগী অঘোরনাথ মরেন নাই, মনুষ্য জন্ম পরিত্যাগ করিয়া দেবত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ; মনুষ্য অঘোর বিশ্বসংসার হইতে তিরোহিত হইয়াছেন, কিন্তু দেবতা অঘোর আমাদের সম্মুখে। অঘোরনাথের জীবনের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এ পৃথিবীতে ফলশূন্য হইবে না। তাঁহার জীবিতাবস্থার ফলাপেক্ষাও তাঁহার মৃত্যুর ফল প্রবলতর হইবে। আমি ক্ষুদ্রাশয় মনুষ্য, আমি মনুষ্য অঘোরের জন্যে কাঁদিতেছি, দেবতা অঘোর কি পদার্থ বুঝিতে পারি না, বুঝিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিব। আর লিখিব না, পত্র দীর্ঘ হইয়াছে, আমার চক্ষের দৃষ্টিও সহসা বন্ধ হইল।”

অঘোরনাথ উৎসাহের অবতার ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার স্বর অতি গম্ভীর। তাঁহার সকল কথাতেই সময়ে সময়ে মহা উৎসাহ প্রকাশ পাইত। বেশী উচ্চ শব্দ বলিয়া কেহ কখন ধমক দিলে তিনি অমনি সুবোধ বালকের ন্যায়

চুপ করিতেন। তাঁহার বিরহ শোকে আজ সমুদায় ব্রাহ্ম-সমাজ কাঁদিতেছে। অঘোরনাথ নববিধানবৃক্ষের একটি সুপক্ক সুরসাল ফল। বিধাননাটকের যে অংশ অভিনয় করিবার জন্য তিনি মনোনীত হন, তাহা পূর্ণ উৎসাহে নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়দর্শন যোগীবেশ, সুমধুর ধর্ম্মভাব, চরিত্রের নির্ম্মল সৌন্দর্য্যচ্ছটা অবলোকনে শ্রোতৃবর্গ মোহিত হইতেছিল, সহসা মৃত্যুর যবনিকা পড়িয়া গেল। নব সাজে সজ্জিত হইয়া যোগমগ্ন চিত্তে হাসিতে হাসিতে যবনিকার অপর পার্শ্বস্থ অভিনেতৃগণের দলে গিয়া তিনি মিশিলেন, স্বর্গে দেবপরিবারে মঙ্গলধ্বনি হইল, প্রাচীন যোগীর দলে নববিধানের নবীন যোগী প্রবেশ করিল; কিন্তু পৃথিবীতে তাঁহার বিরহশোকে আমরা কাঁদিয়া উঠিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে মৃত্যুযবনিকা ভেদ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে শোক দূর হইল, ইহ-পরলোকের ব্যবধান চলিয়া গেল, অমরধাম নিকট হইল। যোগচক্ষে তাঁহাকে দিব্য লোকে বাস করিতে দেখিলে হৃদয় শান্তি লাভ করে। মা আনন্দময়ী জননীর চরণ-কমলে প্রণাম করিবার সময় অন্যান্য সাধুগণের সঙ্গে স্নেহের ভাই অঘোরনাথের সঙ্গেও দেখা হয়। আহা! একটি দেব-জীবনের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! যত তাহা ভাবি, ততই মনের মধ্যে নব নব ভাবের আবির্ভাব হয়। হৃদয়বন্ধুর জীবন যেমন মহৎ, মৃত্যুও তেমনি গৌরবান্বিত। সুখের

মৃত্যু তাঁহার অমর জীবনকে আরও সঞ্জীবিত করিয়াছে। পৃথিবীতে কত লোক জলবিম্বের ন্যায় উঠিতেছে, আবার কালসাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কে কাহার সংবাদ লয়? কিন্তু যাহার জীবন শত শত সারবান্ চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে জাগরূক, যাহার মরণে ভক্তমণ্ডলী কাঁদে, সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ শোকবস্ত্র পরিধান করে, সহৃদয় ব্যক্তিরা এক-বিন্দু অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হয়, তাহার জীবন মরণ ভগবানের লীলাভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। এপ্রকার জীবন মরণ সাধুদিগের বাঞ্ছনীয়। ভাবী-বংশ তাঁহাকে সাধনের পথে সহায়রূপে লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতজ্ঞ হইবে সন্দেহ নাই। সাময়িক অসার অনিত্য ব্যাপার সকল কালস্রোতে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু যোগী অঘোরনাথের অনন্ত জীবন অগ্নির স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া নিত্য কাল নববিধানের সাক্ষ্য দান করিবে।

ভাই অঘোরনাথ সময়ে সময়ে এবং পরলোক গমনের পূর্ব্বে আপনার সহধর্ম্মিণীকে যে সকল পত্র লিখিয়াছি-লেন তাহার কয়েক খণ্ড এখানে উদ্ধৃত করা গেল। আমা-দের বন্ধুর গুপ্ত জীবন কিরূপ খাঁটি ছিল তাহার আভাস ইহাতে পাওয়া যাইবে।

১। "যোগেতে তুমি কে? অনন্ত প্রেমসাগরে তুমি কেবল আত্মা, তুমি কেবল নিত্য চৈতন্য। সেই মায়ের বক্ষের ভিতর, অর্থাৎ তাঁর প্রকাশের ভিতর, তাঁর স্বরূপের

মধ্যে তুমি আমি এক, আর দুই নাই। ইহা দেখিয়া যোগ সাধন করিবে, কেবল উপাসনার মধ্যে থাকিবে। তাহাই আহার পান জানিবে, তাহাই নিত্য সম্বল জানিবে. এবার এইরূপে প্রস্তুত হও আর কি। অনেক কার্য্য করিতে হইবে। কেবল আহার করা ও সংসারে থাকার জন্য তোমাদের জীবন নহে। তোমাদের জীবনের অনেক মূল্য, সংসারের বিষয়ে কেবল তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে। কোনরূপ অসুবিধা হইলে তাঁহার চরণে নির্ভর করিয়া দুঃখশান্তি করিবে। নীচ ভাব কিছুই প্রকাশ করিবে না। আমাকে ধর্ম্মের সংবাদ দিবে, উপাসনার বিষয় জানাইবে।"

২। "যোগের ভিতর তুমি আমার সঙ্গে আছ, আমিও তোমার কাছে আছি। তুমি উপাসনাতে এই দর্শন লাভ করিবে। আমি প্রতিদিন উপাসনার সময় তোমাদিগকে দেখিয়া থাকি। সে দর্শন অতি মধুর। তবে আর বিচ্ছেদ ভোগ করিবে কেন? প্রতিদিন যোগী ভক্তদিগকে প্রণাম, সাধ্বী নারী সীতা প্রভৃতিকেও প্রণাম করিবে। নির্জ্জনে যোগ সাধন করিবে। আর দুঃখ থাকিবে না। বিশ্বাস করিবে, কেবল তাঁহাকে ডাকিবে, টাকা কড়ির জন্য কিছু ভাবিবে না ও দুঃখিত হইবে না।

৩। "বিশুদ্ধ প্রেমে ক্রোধ নাই। আমি যে তাঁহার আনন্দ ও দর্শনে ডুবিয়া গিয়াছি। তোমাকে হৃদয়মন্দিরে

রাখিয়া দিয়াছি। পত্র নাই লিখিলাম, তাহাতে ক্ষতি নাই। তুমি যে আমার সঙ্গে উপাসনাতে নিয়ত আছ। এই ত প্রেম। তাহা কি আর তুমি বুঝিতে পারিবে? এবার তোমাকে যোগিনী সাজাইব এই আমার সাধ, ফকির করিব এই ইচ্ছা, প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

৪। "বড় অনিয়ম কর তাই এত কষ্ট পাইলে। তুমি প্রেমের হরি যিনি তাঁহার জন্য বিশেষ কষ্ট কিছু গ্রহণ কর দেখি। আমি অসার মনুষ্য, আমার জন্য এত কর কেন? আমি আসিয়াছি আর বিধাতার এক পরীক্ষা তোমার ঘাড়ে পড়িয়াছে। এবার বিশ্বাসী ও তোমায় ভক্ত করিবার জন্য বিধাতা এইরূপ করিতেছেন, খুব বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে ডাকিবে। তাঁর প্রেমে ডুবিবে, আর যোগ সাধন করিবে, তাহা হইলে সব পাপ দুঃখ কাটিয়া যাইবে। কলিকাতার সব ভাল সংবাদ দিবে। আর সাধন ভজন কিরূপ চলিতেছে, মেয়েরা সব কি করিতেছেন, কিরূপ উপকার হইতেছে। যাহাতে তোমাদের মধ্যে বৈরাগ্য ও খুব ধর্ম্মের তেজ হয় তাহা করিবে। এবার প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। এ দেশে আসিয়া মেয়েদের মধ্যে হরি নাম প্রচার করিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁর স্বর্গের অন্ন খাইতে পাইবে না। একেবারে মাটীর মানুষ হইয়া স্বর্গের দেবী হইবে।"

"যোগে এক" এইরূপ সম্বোধন করিয়া তিনি সচরাচর

সহধর্ম্মিণীকে পত্র লিখিতেন। তাঁহার গোপনীয় পত্র সকল অতি উচ্চ ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ থাকিত। তিনি আপনার ধর্ম্মবন্ধুদিগকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লেখকের নিকট তাঁহার যে সকল উৎকৃষ্ট পত্র ছিল তাহার কয়েক খণ্ড নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। "প্রিয়বন্ধু, আমি প্রীতিভরে আপনার পদচুম্বন করি। আপনার পত্রখানি বেশ মিষ্ট লাগিল। তাহার কারণ হৃদয়টা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। তাঁহার প্রেমের ভিতর মানুষ আর দুটো থাকে না, একটা হইয়া যায়। সেই প্রেমই প্রকৃত বন্ধুতার কারণ, সেই প্রেমই বন্ধুতার বন্ধন, সেই প্রেমই প্রেমময়ের ভিতর মিশাইয়া দিয়া দুটো জিনিষকে এক করিয়া দেয়। সেই প্রেমের নিকট ইচ্ছা ও প্রার্থনা এক হইয়া যায়। কথা গুলো কি এলো মেলো হইতেছে? কি বলিতেছি? পাগলের মত চিত্ত বেফাঁস কথা বলিতেছে? হইলই বা, তাহাতে ক্ষতি কি। আমি প্রতিদিন উপাসনার শেষে প্রভুর নিকট একটি মিষ্ট কথা বলি। হৃদয় কয়েক খানা এক হইয়া যাউক্ এই ভাবের কথা বলি। প্রায় একমাস হইতে এ ভাব আমার মনে বড় উজ্জ্বল হইয়াছে। আমি যাই, আর দ্বারে গিয়ে এই কথাটা বলিয়া আসি। আমার ইহাতে সুখ হয়, ঐ ভাবের দুই চারিটা কথা তাঁহার কাছে রোজ বলাতে আমার মনটা এক বারে ভিজিয়া যায়, আর আহ্লাদে ভরিয়া যায়।

আমার মনের মত এখনো হৃদয়টি ভাসিয়া যাইতেছে না, এ জন্য আমি সময়ে সময়ে বড় দুঃখ পাই। বিশেষতঃ এ প্রদেশে আসিয়া আমার ভাব গজাতে পাইতেছে না, কারণ মধুর উপাসনাতে সিম্‌প্যাথেটিক্ স্পিরীট্ পাই-তেছি না।"

২। "* * * এই সকল ভাব না থাকিলে আমার মনে হয় না যে ব্রাহ্মধর্ম্মের গাছ লাগিয়াছে। আমার ভাবের তরঙ্গ সময়ে সময়ে এমন উঠে তাহাতে আমি কষ্ট পাই। সে কথাটার বিষয় এখন বলিব না, থাক্। আমাকে ধর্ম্মতত্ত্বের বিষয় লিখিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কথা আমার লিখিতে সাহস হয় না, কারণ জীবনে ইহা বেশ করে হজম না করিলে লিখিতে মন সরে না। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা লিখিব, কিন্তু তারও যদি ভাবের ভাবুক পাঠক পাই তবে হৃদয় বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।

৩ "কোন রূপ অত্যাচার দেখিলে কিম্বা অন্যায় ব্যব-হার পাইলে আমি নির্জ্জনে পিতার কাছে বসে মেয়ে মানুষের মত কাঁদিয়া ফেলি। বন্ধুদিগকে সে বিষয়ে কোন কথা বলা নীচতা মনে হয়। এই ভাবটা আমার বড় মিষ্ট বোধ হয়। ঐ রূপ দুঃখের সময় আমার বড় সুখ হয়। কীট গুলি সজীব থাকিলে ভিতরের মালের কিছু লোক্ সান্ করে। কেমন সত্য নয় কি? প্রেম বড় কোমল পদার্থ, সুতরাং সেই স্বর্গের বস্তুর প্রতি অনেক তদ্বির না

থাকিলে জীবনে তাহার সঞ্চার হয় না। একি মুখের কথা যে ধর্ম্ম বলিলেই ধর্ম্ম হয়? আমি জীবনে অনেক রকম পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, অনেক বিশ্বাস চাই; অত্যন্ত বিনয়ী ও মাটীর মতন না হইলে ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার যো কি? আমাব নিকট এ জন্য এই দুইটি বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার মধুর সহবাসের ভিতর ডুবে যাওয়া, * * * ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করা। এই আমার জীবনের সার। এই দুটি হইলেই আমার সব হবে আমি যাহাতে হাত দিব তাহাতেই সিদ্ধ হইব। "প্রথম স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ, পরে যাহা প্রয়োজনীয় তাহা প্রাপ্ত হইব" এই অমূল্য সত্যের কি কোন অর্থ নাই? ইহা যে বেদ বাক্য, কখন খণ্ডন হইবার নহে।"

৪। "হৃদয়ের প্রিয় বন্ধু! আজ কিছু অসুখ করিয়াছে, শরীরটা ভাল নাই, সমস্ত দিন আহার করি নাই, বেশ জর ভাব। এটাকে বেশ জব্দ করিতে হইবে, তাহাকে না মারিয়া ফেলিলে কি রগ্‌রগ্‌ করে নূতন জীবনটা বাহির হইবে? মনটা কেবল আগুনের রাশি হয়ে থাকুক, তাহা হইলে আর পীড়া শীড়াতে কিছুই করিতে পারিবে না। তাঁহার সুধার পীপের ভিতর মজা করে ভোঁ হয়ে থাকা চাই। হৃদয়টা বেশ ভোঁ হয়, কিন্তু পাতি মাতাল নাকি, তাই নেশাটা শীঘ্র চটে যায়; ঢাল আর খাও, এটা না হইলে আর সুখের তরঙ্গে মনটা ভাসিতেছে না। সময়ে সময়ে

প্রিয় সখার সহবাসটা এত মধুর যে কেবল ঐ সুধা পান করিতেই ভাল লাগে। তাঁহার পা টিপিতে ভাল লাগে। কিন্তু বলিতে কি ইয়ারের জটলা না থাকিলে সুধাপান করে চলা চলি হয় না। কিছু চলা চলিতে আবশ্যক হইয়াছে। নেশার চোটে হাত পা গুলো এলিয়ে পড়িবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ ব্যাটা ভূতও ছেড়ে চলিয়া যাইবে।

এখানে দুইটি পরিবার বেশ আছে। তাঁহাদের ভাব অতি সুন্দর। জীবনের ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে কেবল প্রভুর সহবাস ও সুমিষ্ট সান্ত্বনা বাক্যই মিষ্ট। সেই সহবাসে সকল প্রকার দুঃখ ঘুচিয়া যায় এই জন্য এত প্রিয়তম তিনি। তিনি প্রিয়তম না হইলে আর বৈরাগ্যের সুখ নাই। এমন দর্শনে মন প্রমত্ত ও আনন্দে বিহ্বল যে বৈরাগ্য অন্তরের স্বভাব হইয়া গিয়াছে, আহা! সেই অবস্থা কি স্বর্গীয়। যাহা দেখি তাহাই প্রিয়তমের সহবাসের হেতু হয়, তাহাই জীবনের এক সুমধুর স্রোতের প্রস্রবণ হয়। এমন ভাব বড় প্রার্থনীয়, হৃদয়টা ইহার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। বাস্তবিক এ অবস্থা সময়ে সময়ে লাভ করিয়া আমার বড় লোভ জন্মিয়াছে।”

৫। “হৃদয়ের প্রিয়তম বন্ধু! অনেক দিন আপনাদের কোন সংবাদ পাই নাই। না পাইলাম তাহাতেই বা ক্ষতি কি? প্রিয়সখার কাছে যে দর্শন হয় সেই সুখের দর্শন, ~~তাহা~~ অপেক্ষা মিষ্ট কি আর আছে। আমার হৃদয় বড় পক্ষপাতী

হইয়া পড়িয়াছে ; কিসের পক্ষপাতী ?—প্রেমের ও প্রিয়সখার সহবাসের। আমি আপনাকেও ইহার পক্ষপাতী হইতে অনুরোধ করি। কিন্তু উহা যে বড় কোমল পদার্থ, কোনরূপ ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা থাকিলে আর সম্ভোগ করা যায় না। ইহাতেই ভাবের তরঙ্গ উঠে ও হৃদয়ের মত্ততা জন্মে, হৃদয় এত কোমল হয় যে নয়নে কেবল আনন্দ ও প্রেমের জল টস্ টস্ করিয়া পড়ে। ইহা না হইলে আমার সুখ হয় না, আমি যেন মরে থাকি। আমি বন্ধুতার সুখ ইহাতে সম্ভোগ করি। এখনও একটা ইন্দ্রিয় কখন কখন উঁকি ঝুঁকি মারে, সেই জন্য সময়ে সময়ে ঐ প্রেম ও সহবাসের বিচ্ছেদ হয়। সেটা নির্ম্মল হইতে আরও গাঢ় ও গভীরতর প্রেম চাই। যত মত্ততার বেগ, তত পার্থিব সুখস্পৃহার বিনাশ, এই জানিয়া হৃদয়ের সমুদায় চেষ্টা ঐ সাধনে নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। বিধাতার হস্তে এখন নির্ভর। আপনি কি বলেন ? এরূপ হৃদ্গত সুখ কি আর কোথাও পান ?—যখন প্রাণটা তাঁহার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায় তখন আমি আপনাদের অন্বেষণ করি। কেন করি ? ঐরূপ এক করিতে, আমার এ সুখের ব্রত। আমার এ সুখের নিয়ম। আপনারা কি এ ব্রতের ব্রতী হইতে ভাবিতেছেন ? না ভাবিয়াই বা থাকিতে পারেন কৈ ? এ চক্রের ভিতর যখন হৃদয় পড়িয়াছে তখন আর যাবে কোথায়। ভাল তারিয়ে তারিয়ে খাবার সময়টা।

বটে। এ পথে যে বড় দুঃখ ও যন্ত্রণা আছে সেটি কেবল ভাবের হ্রাস পাইলে অনুভব করা যায়।

"আর একটী কথা বলি। আমার জীবনের একটি প্রধান আদর্শ এই, আপনার সমুদায় মত ও ভাব বন্ধুদিগের নিকট কেবল জীবনের দ্বারা চরিত্রের দ্বারা প্রকাশ করি। ইহা আমার একটি সার বিষয় বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, প্রাণপণে চেষ্টা হইয়াছে। যত বাহিরে উত্তাপ তত ভিতরে শীতল, যত বাহিরে বন্ধু বিচ্ছেদ, তত ভিতরের বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠতা অধিক। যত বাহিরে অসারতা নীচতা তত ভিতরে সার ও মহৎ বস্তুর প্রতীতি। অত্যন্ত বিশ্বাস, অতিশয় বিনয়, তাঁহার মনোহর দর্শন, পুণ্যের ভিতর মগ্ন হইয়া আপনাকে নূতন করা, তাঁহার প্রেমে হৃদয়টা সর্ব্বদা সরস রাখা, এই গুলি জীবনের সার ধন, আমার মন কেবল ইহার জন্যই। আমি জানি এই সব থাকিলে আমি জগৎকে বশীভূত করিতে পারিব, শত্রুকে মিত্র করিতে পারিব * * ঐরূপ কুৎসিত ভাব চূর্ণ করিতে পারিব। আপনার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিলাম পৃথিবীর নীচ ভাব কোনরূপে স্থান না পায় এই আমার একান্ত প্রার্থনা। আসুন আমরা কেবল জীবনে ইহাই প্রচার করি।"

গয়ার কোন সাধকবন্ধুকে সাধু অঘোরনাথ এই কয়-থানি পত্র লিখিয়াছিলেন।

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার

আপনার দুই পত্র পাইয়াছি। ব্যস্ত সমস্ত হইবার কর্ম্ম নয়, আরও ভিতরে প্রবেশ করুন। প্রণালীপূর্ব্বক যাইতে হইবে, তাড়া তাড়ি করিলে কি ধর্ম্ম হয়? তাড়া তাড়িতে কেবল রেলের গাড়িতে চড়া যায়, আপনি আমার নিকট এইরূপ ধর্ম্ম চান, তাহা বাজারে পাবেন এ দোকানে নাই। খুব স্থিরতা অবলম্বন করিবেন তবে তো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পাহাড়ের মত স্থির গাছের মত স্থির। এই মানসিক স্থিরতাতে ঈশ্বরের দর্শন। ইহাতেই তাঁহার কথা শুনা যায়। ইহাতেই চিত্তের শুস্থতা হয়, ইহাতেই ইন্দ্রিয়ের দমন হয়,ইহাতেই তাঁহার প্রতি প্রেমের উচ্ছ্বাস উঠে। এ সব নির্জ্জনে বসিয়া ধারণা ও সাধনা করা চাই। কিছু কাল করিতে করিতে তবে তো হইবেই হইবে। এই যে কথা কয়েকটা কহিলাম ইহা জীবনে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এখন কিছু দিন লাগিবে।

(২) আপনি বৈরাগ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাস্তবিক কথাই বটে। সংসারে বৈরাগ্যসাধন অতিশয় কঠিন। আমি নিজের জীবন দেখিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে প্রকৃত বৈরাগ্য এখন আমার কিছুই হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে আমি আপনাকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত নাই। ঐ যে আমার বিনয়ের কথা তাহা মনে করিবেন না। আমি স্বরূপতঃই বলিতেছি। যথার্থ বৈরাগ্য যাহার

জীবনে আছে সে তো নিষ্পাপ, তাহার জীবন প্রকৃত পক্ষেই শুদ্ধ। আমরা প্রথম হইতেই বিলাস অবিশ্বাস ও সভ্যতার মধ্য দিয়া আসিয়াছি বলিয়া বৈরাগ্য সাধন অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে বৈরাগ্য সাধন সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; আমাদের ভাগ্যে সেই কঠিন ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। প্রভু যদি দিন দেন ও তাঁহার কৃপা যদি পাই, তবে এই বৈরাগ্য জীবনে এক দিন হইতে পারে। বৈরাগ্য সম্বন্ধে বরং আমি কোন কোন বিষয়ে আপনাকে গুরু বলিতে পারি। এই কঠিন ব্রত অবলম্বন করিতে প্রতিজ্ঞার প্রবল ভাব ও বীরের ইচ্ছা প্রয়োজন। যাহা ধরিব তাহা করিবই করিব। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের সুখ বোধ হয় যেন হাড়ে হাড়ে রক্তে রক্তে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। তাহা আবার অনেক বেশে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য যে ইচ্ছা হইলেও তাহার বন্ধন কাটিতে পারা যায় না। কেবল আগুনের মত উপাসনা ও মত্ততা না হইলে দুরন্ত শত্রুদিগকে পরাস্ত করে কাহার সাধ্য?

(৩) উপাসনার দিকে খুব আনন্দ ও শান্তি না হইলে ইন্দ্রিয়জনিত সুখের প্রবৃত্তি কমে না। উপাসনার ভিতরের ভাব যত গভীর ও মধুর হইবে তত ইন্দ্রিয়গণের প্রবল বেগকে অবরোধ করিবার শক্তি হইবে। এইতো আমার জীবনের পরীক্ষা। এই অবস্থাতে চিত্ত বেশ মগ্ন থাকিলে চারি মাস ছয় মাস কখন বা এক বৎসর এক ঘরে থাকি-

লেও কোন অসুবিধা হয় না। ইহার দ্বিতীয় উপায় চিন্তাকে সংযম করা। ইহা নিশ্চয়ই সত্য জানিবেন, কামাদি রিপু উত্তেজিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তদ্বিষয়ক চিন্তা হইবেই হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং এই চিন্তা মনে উঠিবা মাত্র ঈশ্বরের পানে চাহিয়া দূর হ! বলিতে পারিলে সে চিন্তা তৎক্ষণাৎ চলিয়া যায়। বলপূর্ব্বক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিলে তাহাতে রিপুগণ আরও প্রবল হয়, অতএব সেরূপ ক্লেশ করা বিধেয় নহে। উপাসনার সঙ্গে যদি কোন কষ্টগ্রহণ করা সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকট হইতে শুনিতে পান, তাহা হইলে সে কষ্টে হৃদয় পবিত্র হয় ও ইন্দ্রিয়াদির বল কমিয়া যায়। এইতো এ বিষয়ে কথা। আর নির্জ্জনে বসিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে পবিত্র ভাবযোগ অভ্যাস করিতে হইবে।—যেমন কামের বিষয় নারী। তাহাতে পবিত্র ভাব সংস্থাপন করিতে হইবে। কি করিয়া করিতে হয় তাহা বলি। হে নারী, তুমি ঈশ্বরের মাতৃভাবে নির্ম্মিত। সেই স্বর্গীয় স্নেহ কোমলতা প্রেমের আবির্ভাব। এইরূপ যোগাভ্যাস করিতে করিতে এমন সহজে একটী আলৌকিক ভাব লাভ করিবে।"

ধ্যান সহজ হইবে। সহজ ভাবে না হইলে ধ্যান হয় না জানিবেন। অনেক ক্ষণ বসিয়া থাকিলে যদি না হয়, অথচ অন্যার চিন্তা আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে সে দিন হইল না। আমার মতে ঐ রূপ প্রণালী নহে। একটা সহজ উপাসনা

ও ভাবের অবস্থা আছে, সেই অবস্থাটী স্থির, তাহা কখন কমে না। তাহার উপর ধ্যানের পত্তন ভূমি। সুতরাং তাহা হইলে প্রতিদিন ধ্যান নিশ্চয়ই হইবে ইহাতে আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাস এবং উপাসনা ও ঈশ্বরদর্শনের একটা গভীর ইচ্ছা, এই গুলি ধ্যানের সাধারণ ভূমি। অতএব এই সাধারণ ভূমির উপর চিত্ত রাখিয়া ধ্যান করিতে বসিবেন, তাহাতে আর কিছু মাত্র বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনি বসিয়া থাকার উপর কিছু মাত্র দৃষ্টি রাখিবেন না। আমার এই কথা গুলি জীবনে অনুভব করিবেন। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন ইহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। নিরাকার ঈশ্বরকে সাকারের মত পূজা করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের কাজ, এই জন্যই তিনি আসিয়াছেন, পৃথিবীতে এই ইহার নূতন। এমন নূতন ব্যাপার আর নাই।"

অঘোরজীবন ১৭। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে বিয়াল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা, আসাম, পাঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম, বোম্বাই, মধ্য ভারতবর্ষ, অযোধ্যা, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশে সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিল, এ সকল দেশের প্রায় প্রত্যেক প্রসিদ্ধ নগর উপনগর ভ্রমন করিল, ইহার অধিকাংশ স্থান দুই তিন চারি পাঁচ বার পরিদর্শন করিল, পুস্তক পত্রিকা লিখিল; গৃহধর্ম্ম পালন করিল, নির্জ্জনে সজনে ধর্ম্ম সাধন করিল, ক্রমাগত একুশ বাইশ

বৎসর ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া শেষ বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিল, দেখিতে গেলে ইহা কি এক দিকে অসাধারণ নহে? নিঃস্বার্থ ভাবে স্বাধীন ভাবে এই কার্য্যে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই ভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। কখন পার্থিব পদার্থ বা মনুষ্যের মুখাপেক্ষা করেন নাই। কর্ত্তব্য সাধন, পরমপ্রভুর পদ সেবাই এক-মাত্র উদ্দেশ্য ছিল। হাতে হাতে এ কার্য্যের পুরস্কারও তিনি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ভাই অঘোরনাথের জীবন বিধা-তার হস্তের একখানি বিচিত্র ছবি। ধর্ম্মরাজ্যের যে সকল মত ভাব এবং বিশ্বাস অনুষ্ঠান সাম্প্রদায়িকতার চক্ষে পর-স্পর বিরোধী বলিয়া আপাততঃ মনে হয়, তাহার সুন্দর সমন্বয় তাঁহাতে প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছে। যোগী অঘোর এক দিকে বৈরাগ্যবস্ত্রধারী, নিরামিষভোজী, শুদ্ধাচারী হইয়া দেশীয় ঋষিভাবের অনুসরণ করিতেন, বেদ উপনিষৎ যোগবাশিষ্ঠ গীতাদি শাস্ত্র পড়িতেন; অপর দিকে মহাযোগী ঈশার চরিত্রসুধা পান করত সুখী এবং পবিত্র হইতেন। বৈদেশিক ধর্ম্মভাব ও সাধুচরিত্রসকল জাতীয় ভাবের সহিত মিলাইয়া তদ্দ্বারা তিনি জীবনের সমস্ত বিভাগের উন্নতি সাধন করিতে শিখিয়াছিলেন। কখন দরিদ্রবেশে পদব্রজে নানা দেশে পরিভ্রমণ, কখন চাপ্‌কান্ প্যান্টুলন পরিয়া সামলা মাথায় দিয়া মহিলাগণের সভাস্থলে দণ্ডায়মান; কখন শূন্যপদে একতন্ত্রী হস্তে গৈরিক বসনাবৃত শরীরে পথে পথে

কীর্ত্তন, কখন শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীতে অবস্থিতি, সংন্যাসী ও পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালাপ; এইরূপ সকলই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। সভ্যসমাজে বাস করিতেন, কিন্তু সভ্যতার অবিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়বিলাসিতা অভক্তি অনাচার হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতেন। আহার পান বিবাহ যাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্য তাহাদিগের মধ্যে অঘোরনাথকে দেখিতে পাইবে না, কিন্তু উপাসনা, যোগভক্তিসাধন, চরিত্রশুদ্ধি যেখানে সেই খানে তাঁহার সহিত সর্ব্বদা দেখা হইবে। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের যোগধ্যানে চিত্তকে ডুবাইয়া পৃথিবীর যাবতীয় সাধু মহাজনদিগকে ভক্তি করা ভালবাসা, তাঁহাদের সাধু গুণের অনুকরণ করা, সর্ব্বত্র একেরি মহিমা দেখা, নিরাকার চিন্ময় হরির ভক্তি প্রেমে প্রমত্ত হওয়া, সর্ব্বদেশীয় নর নারীকে ভাই ভগ্নী জ্ঞানে প্রীতি করা তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ, বেদ, ভাগবত কোরাণ, বাইবেল, ললিতবিস্তার প্রভৃতি শাস্ত্রের মধ্যে এবং ঈশা মুশা নানক চৈতন্য জনক শঙ্করাচার্য্য মহোম্মদ পল লুথর প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে এবং আধুনিক ও প্রাচীন পণ্ডিতদিগের রচিত ধর্ম্মবিজ্ঞানশাস্ত্রে, এমন কি নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞানীর ভিতরেও তিনি ব্রহ্মকে দেখিতেন। ফলতঃ বিশ্বের সর্ব্ব প্রকার সাধু চরিত্রে ও হিতকর অনুষ্ঠানে তিনি সেই আদিপুরুষ ভগবানেরই মহিমা অবলোকন করিতেন। ইহপরলোকবাসী সমস্ত

মানব পরিবার একটি অখণ্ড পদার্থ, সকল ধর্ম্ম জ্ঞান ও নীতি-শাস্ত্র এক, যাবতীয় সাধু মহাপুরুষ একটী অমর পরিবার অভেদ আত্মা, এই প্রকার তাঁহার বিশ্বাস ছিল এবং তদনুসারে তিনি আপনার চরিত্র সংগঠন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মেতে সমস্ত বিশ্ব এবং সমস্ত বিশ্বেতে ব্রহ্ম, আমাতে সমুদায়, এবং সমুদায়েতে আমি, এই তাঁহার যোগ মন্ত্র। ঈদৃশ উদার ধর্ম্ম ভাবের মধ্যে থাকিয়া তিনি কি কখন আপন পরিবার পুত্রগণের প্রতি মমতাশূন্য ছিলেন? না, সে বিষয়ে স্বভাবের পথ কখন অতিক্রম করেন নাই। প্রেমিক পিতা এবং সহৃদয় স্বামী হইয়া পুত্র পরিবারকে যথেষ্ট ভাল বাসিতেন। এক দিকে বৈরাগ্য সাধন, অন্য দিকে গৃহধর্ম্মানুরাগ; এক দিকে যোগের শান্তি, অন্য দিকে ভক্তির মত্ততা, সেবার উৎসাহ, জ্ঞানোপার্জ্জনস্পৃহা; এক দিকে অদ্বিতীয় অখণ্ড ঈশ্বরে ঐকান্তিক আসক্তি, অপর দিকে সাধু ভক্তের প্রতি আনুগত্য; যাবতীয় সাধু ভাব তাঁহার ভিতরে সমাবেশিত হইয়াছিল। স্বীয় আচার্য্য উপদেষ্টার চরিত্র এবং শিক্ষা তিনি নিজ জীবনে বহু পরিমাণে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার স্বভাবে বিশেষ যোগানুরাগ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। বহু প্রতিবন্ধক সত্বেও নববিধানযন্ত্রে কিরূপ চরিত্র সংগঠিত হইতে পারে, অঘোরনাথ তাহার দৃষ্টান্ত। জীবনটি দেখিলে বোধ হয় যেন মনের প্রত্যেক চিন্তা, ভাব, শরী-

রের প্রত্যেক পরমাণুকণা এবং রক্তবিন্দু ঈশ্বরসেবায় নিয়োজিত ছিল। মঙ্গলস্বরূপ বিধাতা পুরুষ এই নিখিল বিশ্বধাম শাসন এবং জীবগণের পরিত্রাণের জন্য যে সকল ধর্ম্মবিধান বিধিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, বর্ত্তমান বিধান সেই সকলের দ্রাবক ও প্রেমবন্ধনী, ভাই অঘোর সেই মিশ্র উপাদানে রচিত। এই কাজে ব্রতী করিবার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন, উপযুক্ত ধর্ম্মভাব এবং সদ্গুণ দিয়াছিলেন, প্রথমে সর্ব্বস্ব হরণ করতঃ পরে তিনি আবার তাঁহাকে গৃহাশ্রমে স্থান দান করেন। এক্ষণে তিনি আপনার দিব্যধামে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছেন। নিরাকার উপাসক—যে মধ্যবর্ত্তী অবতার কিংবা অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তক মানে না—সে শান্তি পায় না, এই কথা অনেকে বলেন; কিন্তু অঘোরনাথ সে পুরাতন আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার চিরপ্রসন্ন মুখ, প্রশান্ত হৃদয়, নির্ম্মল চরিত্র এবং অগ্নিময় উৎসাহ ইহার জীবন্ত প্রতিবাদ।

যোগী অঘোরের চরিত্র আদ্যোপান্ত যেরূপ বর্ণিত হইল ইহা পাঠ করিয়া অনেকের মনে হইতে পারে, তবে কি তিনি নিষ্কলঙ্ক স্বর্গদূত ছিলেন? কাহারো জীবন চরিত লিখিতে হইলে কি এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া না লিখিলে শুনিতে ভাল হয় না? ঠিক যাহা স্বাভাবিক তাহাই বর্ণন করা উচিত, অত্যুক্তি বর্ণনা সত্যের বিরোধী এ কথা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করি এবং সেই

ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কোথাও লিখিবার যোগ্য দোষ দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইলাম না।

জগতে অসংখ্য মানবজীবন আছে, তাহাদের প্রত্যেকের এক এক প্রকাণ্ড ইতিহাসও আছে, কিন্তু তাহা কে পাঠ করিতে চায়? "তরবোপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগ পক্ষিণঃ। স জীবতি মনো যস্য মননেনহি জীবতি" ব্রহ্ম মনন দ্বারা যাঁহারা জীবিত বাস্তবিক তাঁহাদেরই জীবন পাঠোপযোগী। আমাদের বন্ধু সেই শ্রেণীর লোক ছিলেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগের জীবনেও কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের উদয়াস্ত আছে সত্য, কিন্তু অঘোরনাথের জীবন তাহার মধ্যেও কিছু বিশেষ লক্ষণযুক্ত। এই জন্য তাঁহাকে জগতের সম্মুখে নির্দ্দোষ চরিত্র সাধু বলিয়া আমি প্রকাশ করিতে সাহসী হইতেছি। এই মহাত্মার জীবনের স্বর্গমুখগতি কখন বাধা পায় নাই। যদি কখন স্রোত মন্দীভূত হইয়া থাকে, তবে তাহা পর ক্ষণে প্রবলবেগে ধাবিত হইবার কারণ হইয়াছে; কিন্তু তাহা একেবারে কোন দিন বন্ধ হইয়া যায় নাই। শান্তি এবং দৃঢ়তা এমন জীবন্ত যে, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সংযতচিত্ত যোগী অঘোর যে গৃহে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন তাহা অতীব সঙ্কীর্ণ, এবং একটী জনাকীর্ণ পণ্যশালা; শত শত লোক তথায় নিয়ত ক্রয় বিক্রয়ের জন্য কোলাহল করে। কিন্তু তিনি যোগবলে

তাদৃশ অশান্তিপূর্ণ স্থানেও স্থির ভাবে দুঃসহ রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন। শেষ যেন অনন্ত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অনন্ত জীবনে প্রবেশ করিলেন। যোগের শান্তি জীবনে যেমন, মৃত্যুশয্যাতেও তেমনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

তবে এ কথা বলিতে হইবে, চন্দ্রেও যখন কলঙ্ক আছে, স্বর্গের দেবচরিত্রও যখন অপূর্ণতাদোষবিরহিত নহে, তখন এক জন সাধু মনুষ্য, গৃহী ব্যক্তি কেমন করিয়া দোষস্পর্শশূন্য হইবেন? সম্ভব নহে। শরৎকালীয় তরল মেঘের ন্যায় সংসারের মোহ তাঁহার যোগ বৈরাগ্যের জ্যোতিকে সময়ে সময়ে আচ্ছন্ন করিয়াছে। পারিবারিক জীবনকে কখন কখন বৈষয়িক মায়া আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। নববিধানের পূর্ণ বৈরাগ্য, ও অনাসক্তির সঙ্গে তুলনা করিলে এ দোষ তাঁহার উপরে আরোপিত হইতে পারে। কিন্তু সাংসারিক ও পারিবারিক অবস্থা তাঁহার যেরূপ পরীক্ষাপূর্ণ ছিল তাহা ভাবিয়া দেখিলে এ দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে আইসে না। অথবা আসিলেও তাহা দয়ার চক্ষে সকলকে দেখিতে হয়। বিশেষতঃ এরূপ দোষ দুর্ব্বলতা তাঁহার ক্ষণস্থায়ী ছিল। তাঁহার স্বাভাবিক বৈরাগ্য যোগধর্ম্ম কোন দিন হীনপ্রভ হয় নাই। তাঁহার শেষ জীবন মেঘোন্মুক্ত শারদীয় শশধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। পরলোক গমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে কয়েক মাস যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে

হয়। বিশেষ অনুধাবন করিয়া ভাই অঘোরনাথের সমগ্র জীবন আমি দেখিলাম, প্রতিবর্ষের জীবন অনুসরণ করিলাম, কিন্তু কোথাও আমার বিবেক বুদ্ধি, উচ্চ রুচি বাধা পাইল না। বরং যতই উহার ভিতরে আমি অবতরণ করিলাম ততই প্রশংসা ও যশোগুণ কীর্ত্তন করিবার ইচ্ছা আমার বলবতী হইল। অপর সাধারণ সেরূপ দৃষ্টিতে ইহাঁকে দেখিবার অবসর পান নাই। আমার সহিত তাঁহার যেরূপ নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহাও তাঁহাদের সঙ্গে নহে,এই ভাবিয়া আমি কুণ্ঠিত হইতেছি। কিন্তু তথাপি চিত্তের বেগ কি সম্বরণ করা যায়? আমি যাহা কিছু তাঁহার সাধুতা ও গুণের কথা বলিলাম,তাহা যে কেবল বিধানসেবক ও বিধানবাহকদিগের হৃদয়তন্ত্রে প্রতিনাদিত হইবে তাহা নহে, বিধানবিরোধী ব্রাহ্মদিগের হৃদয়েও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিবে। ইহাতে সাধুর গৌরব কিছুই নাই, ভগবানেরই মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেকের অন্তরের কথা আমার লেখনী ব্যক্ত করিল। কিন্তু হায়, এত বলিয়াও যে আমার ক্ষোভ নিবৃত্ত হইল না! প্রাণসখার জীবনসঙ্গীত যেন শীঘ্র ফুরাইয়া গেল বোধ হইতেছে। এমন একটি সারবান্ সাধুজীবন কি কয়েক পংক্তি সামান্য রচনায় পর্য্যবসিত হইবে? তাঁহার সমাধিস্তম্ভের পার্শ্বে বসিয়া যদি অঘোরব্রত চিরজীবন পালন করিয়া তাঁহাকে আত্মার অন্ন পান, হৃদয়ের শোণিত করিয়া রাখিতে পারি, তবেই এ ক্ষোভ নিবৃত্ত হয়। উপাসনার

প্রভৃত আনন্দে মন মগ্ন হইলে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। উৎসাহকর আহ্লাদের ব্যাপারের মধ্যে সেই জীবনবন্ধুর আসনের প্রতি বার বার দৃষ্টি পড়ে। উচ্চৈঃস্বরে যখন যখন হরিনাম কীর্ত্তন করি, তখন তাঁহার ভক্তিউদ্দীপক গভীর স্বর আর শুনিতে পাই না; মৃদঙ্গ বাদ্যের সঙ্গে করতাল-হস্তে, ভিক্ষাঝুলিস্কন্ধে তাঁহার সেই বিনম্র মুখকান্তিও আর পার্শ্বে দেখিতে পাই না।

আহা! ব্রহ্মসম্ভোগ এবং যোগানন্দের মধুর ব্যাখ্যান আর তেমন করিয়া কাহার নিকটে শুনিব। নববিধানের অনুপম সৌন্দর্য্য, উদার ভাব আলোচনা করিতে করিতে তোমার চক্ষু হইতে যে আগুন বাহির হইত, সে মূর্ত্তি আর কি দেখিতে পাইব না? গদগদ কণ্ঠে সজল নেত্রে যখন তুমি উপাসনা করিতে তখন যে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় বিগলিত হইত! ব্রহ্ম-যোগের মধুর ব্যাখ্যান তেমন করিয়া আর কে দেশে দেশে বলিয়া বেড়াইবে? পরলোকটা দূরে ছিল তাহাকে নিকট করিবার জন্য কি বিধাতা তোমাকে সে দেশে পাঠাইলেন? আহা! ভারত ও বঙ্গদেশের কত অগম্য স্থানে অগ্রে তুমি গিয়া সত্যের নিশান উড়াইতে, পরলোক সম্বন্ধেও কি তাই হইল! ভ্রাতঃ তোমার বিচ্ছেদে তোমার ভাই বন্ধুরা কিরূপ মর্ম্মবেদনা পাইলেন তাহা হয় তো তুমি জানিতে পারিলে না।

শোকোচ্ছ্বাস।

(১)

ও হে যোগী ভাই ! ধর্ম্মসখা মিত্রবর,
এ কি হায় ! দেখি অকস্মাৎ !
প্রচার করিয়া ঘরে, আসিবে বৎসর পরে,
আশাপথ চেয়ে মোরা আছি নিরন্তর ;
একেবারে শিরে বজ্রাঘাত !

(২)

আহা ! তব শান্তমূর্ত্তি, প্রসন্ন বদন
ভাসে যেন চক্ষের উপরে ;
থেকে থেকে মনে হয়, সেত ভুলিবার নয়,
কেঁদে কেঁদে ওঠে প্রাণ ঝরেরে নয়ন ;
পরিতাপে হৃদয় বিদরে।

(৩)

কে জানিত আহা ! হেন সুখের সময়
আত্মীয় স্বজনে পরিহরি,
যাবে তুমি পরলোকে, আমরা কাঁদিব শোকে,
উৎসবমন্দির হবে শোকের আলয়,—
তোমার অভাব ভাব স্মরি।

(৪)

কাঁদে রে বিধবা তোর দুঃখে অনশনে,
শ্রবণে ব্যথিত হয় প্রাণ ;
নীরবে কাঁদিছে কত, ধর্ম্মবন্ধু অনুগত,
আকুল অন্তরে, বসি একাকী বিজনে ;
সকলেই শোকে ম্রিয়মাণ।

(৫)

দেখি তব পিতৃহীন পুত্র কন্যাগণে
দুঃখে হিয়া অবসন্ন হয় ;
ছিলে তুমি সব কাজে, সুদক্ষ দলের মাঝে,—
পরের সেবায় কিংবা ভজন সাধনে ;
এবে দেখি দিক্ শূন্যময়।

(৬)

শ্বাপদের গ্রাসে, দস্যুহাতে কতবার
মৃত্যুমুখে পড়িয়া বাঁচিলে ;
মরুপথে দূর দেশে, কত দুঃখ কত ক্লেশে
ভ্রমিলে এবার আজ্ঞা পালিতে পিতার ;
নির্ভয়ে সত্যের সাক্ষ্য দিলে।

(৭)

সতেজ জীবন, আহা! বলিষ্ঠ শরীর,
ধর্ম্মের যৌবনে সুশোভিত ;

ভাবি নাই কভু মনে, এ সময়ে তোমা ধনে
হারাইয়া শোকে মোরা হইব অধীর ;
হায় বিধি এ কি বিপরীত!

(৮)

প্রণমি মায়ের শ্রীচরণে যোগাবেশে,
হাস্যমুখে লইলে বিদায় ;
ভিক্ষাঝুলি কাঁধে করি, বিধান নিশান ধরি,
প্রেরিতপদক গলে পরি বীরবেশে
বাহিরিলে প্রভুর সেবায়।

(৯)

একে একে সব ভাই ফিরে এল ঘরে,—
রণজয়ী হয়ে নিরাপদে ;
কিন্তু হায়! তুমি আর, আসিলে না পুনর্ব্বার,
পিতার আদেশে প্রাণ দিলে অকাতরে ;—
তুচ্ছ করি জীবনসম্পদে।

(১০)

বিধানসেবকদল এত দিন পরে
আহা! হ'ল অঙ্গহীন ;
তোমার বিহনে ভাই, উৎসবে সে সুখ নাই,
পড়েছে শোকের দাগ প্রাণের ভিতরে ;
কাঁদিতে হইবে চিরদিন।

(১১)

বহিছে আনন্দস্রোত ভকতসমাজে,
হাসে গায় নাচে সর্ব্বজনে ;
আহা ! এ সুখের দিনে, কাঁদে প্রাণ তোমা বিনে,
বারে বারে জাগে তব মুখ হিয়ামাঝে ;
বহে শোক আনন্দাশ্রুসনে।

(১২)

পড়িয়া রহিল শূন্য যোগের আসন,
চাহিতে পারি না তার পানে ;
কে আর তেমন করে, অনুরাগে ধ্যান ধরে,
বসিবে সেথানে সখে, বল হে এখন ;
গূঢ় যোগতত্ত্ব কে বা জানে।

(১৩)

সোদর হইতে তুমি পরম আত্মীয়,
তাই প্রাণ কাঁদে তোমা তরে ;
আহা ভাই কোথা গেলে, দুঃখী বন্ধুগণে ফেলে,
ছিলে তুমি আমাদের সকলেরি প্রিয় ;
তোমার বিরহে আঁখি ঝরে।

(১৪)

গৈরিক বসন তব বিধান নিশান,
করতাল পদক আসন ;

ফিরে আসি দেখা দিল, শোকাসিন্ধু উথলিল,
যথা যুদ্ধঅশ্ব ফিরে আসি নিজ স্থান
কাঁদি কহে বীরের নিধন।

(১৫)

বল্ রে নিশান, ধর্ম্মবীরের ভূষণ!
কোথায় রাখিয়া এলি তারে?
আয় তোরে বক্ষে ধরি, আদরে চুম্বন করি,
জুড়াই শোকের ব্যথা সম্বরি রোদন,
দেখি তোর ভিতরে সখারে।

(১৬)

যোগগন্ধময় পুণ্য গেরুয়া বসন!
তোরে হেরি প্রাণ ফেটে যায়;
সন্ন্যাসীর বেশে যারে, লয়ে গেলি দ্বারে দ্বারে
করিলি বৈরাগী যোগী ঋষি তপোধন;
কোথা হায় ফেলে এলি তায়?

(১৭)

ও হে যোগী যুবা এস বিধান মন্দিরে,
নাচ গাও আমাদের সনে;
নয়নে নয়নে রাখি, সদা তব সঙ্গে থাকি,
প্রাণে প্রাণে এক হয়ে আত্মিক শরীরে;
কে ভুলিতে পারে তোমা ধনে।

(১৮)

চিরদুঃখী মোরা এই অবনীমণ্ডলে,
ধনজনসম্বলবিহীন ;
ভাইদের বুকে করি, সুখে দুঃখে কাল হরি,
তাই তোর লাগি আজ ভাসি অশ্রুজলে ;
থেকো ভাই সঙ্গে অনুদিন।

বিভাস।—একতালা।

ভ্রাতৃশোকে হৃদয় বিদরে।
পূজি মা তোমায়, দিনু যায় বিদায়, সে ভাই
আর ফিরে এল না এ ঘরে।

প্রাণের অঘোর যোগী মহাবীর, জয়ধ্বজা হাতে হইল বাহির, করিল তোমার মহিমা প্রচার, ভারতের সীমা হতে সীমান্তরে।

বিন্দু বিন্দু রক্ত করিয়া প্রদান, ঘোষিল জগতে নূতন বিধান, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে তেয়াগিল প্রাণ, যোগে সমাহিত প্রশান্ত অন্তরে।

বিজয় মুকুট পরাইয়ে শিরে, কোলে করি বসো আপন মন্দিরে, রাখ মা যতনে, অমরভবনে, দেখি সেইরূপ সবে প্রাণ ভরে।

গুণকীর্ত্তন।

(১)

জন্মযোগী তুমি সখে, চিহ্নিত সেবক ;
সাধিতে বিধান ধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম,
মাতৃগর্ভে জনমিলে প্রেরিত সাধক।

(২)

বাল্যাবধি শান্তশিষ্ট, সুচরিত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ,
নির্দ্দোষ বালক ছিলে সকলের মাঝে.
প্রকৃতি গম্ভীর অতি, সুবোধ সরল মতি,
অটল উৎসাহী, অনুরাগী সাধু কাজে।

(৩)

জনকের যোগনিষ্ঠা, সাধুব্রত ধর্ম্মতৃষ্ণা
হয়েছিল সংক্রামিত তোমার জীবনে ;
বয়োধর্ম্ম সহকারে, সেই ধর্ম্ম হৃদাধারে
বিকাশ হইয়া প্রাণ দিল কত জনে।

(৪)

বাল্য সহচর সঙ্গে, বাল্যলীলা-রসরঙ্গে
বিহরিতে যবে মুনিবালকের মত ;
অমল মধুর ভাব, সুচরিত সুস্বভাব
ছিল সংগোপনে হিয়ামাঝে অব্যাহত।

(৫)

প্রথম যৌবন কালে, কাটি পাপ মোহজালে
প্রবেশিলে সাধুসংসর্গে কুতূহলে ;
বিদ্যালয় পরিহরি, বৈরাগ্যের পথ ধরি,
সমর্পিলে প্রাণ বিভুচরণকমলে।

(৬)

যে কালে যুবক দল, বিষয়ের হলাহল
পান করি আত্মঘাতী হয় মোহবশে ;
সেই দুষ্ট কাল অরি, সবলে দলন করি
মত্ত হয়েছিলে তুমি যোগানন্দরসে।

(৭)

নব বিধানের কথা, বাখানিতে যথা তথা,
বীরবেশে নানাদেশে করিলে ভ্রমণ ;
সাধন করিলে কত, কঠোর দুশ্চর ব্রত,
দেখাইলে পাপী জনে পবিত্র জীবন।

(৮)

পরিশ্রম অবিশ্রান্ত, সৎশিক্ষা সুদৃষ্টান্ত
ছিল তব জীবনের অমূল্য ভূষণ ;
যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ধর্ম্ম
একাধারে যথাসাধ্য করিলে সাধন।

(৯)

পদব্রজে দীন বেশে, বহু ক্লেশে দেশে দেশে
স্বর্গের নূতন সত্য করিতে ঘোষণা ;

যোগে অনুরাগী হয়ে, হৃদয়সখারে লয়ে,
ভুলিয়া থাকিতে; ছাড়ি বিষয়বাসনা।

(১০)

যোগে শান্ত সমাহিত, সাধুকার্য্যে উৎসাহিত,
ভক্তিরসে বিগলিত গৃহস্থ বৈরাগী ;
সকলের হিতকারী, নির্ব্বিরোধী ব্রহ্মচারী,
মিষ্টভাষী, সত্যপ্রিয় নির্ভীক নিরাগী।

(১১)

আচরিতে সত্যধর্ম্ম, করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম,—
অকপটে জাতি কুলে দিয়ে জলাঞ্জলি ;
অভ্রান্ত নববিধান, করিলে তা সপ্রমাণ,—
মৃত্যুকালাবধি যোগবলে হয়ে বলী।

(১২)

জীবন মরণে সাক্ষ্য দিলে বার বার,—
হরিপদ সার ধন, অমর সাধু জীবন,
যোগবল বিনা আর সকলি অসার।

(১৩)

ধন্য কলিযুগ ! ধন্য উনবিংশ শক !
যে যুগে অঘোর যোগী, চিদানন্দরসভোগী
এসেছিল হয়ে নববিধানবাহক।

(১৪)

তব পদার্পণে ধন্য হ'ল বঙ্গভূমি ;
বাড়িল আর্য্যের মান, ফিরে এল যোগ ধ্যান,
পরম তপস্বী ঋষি ছিলে সখে তুমি।

স্বর্গারোহণ।

(১)

যাও যাও সখে স্বর্গনিকেতনে,
দেবসহবাসে অমর ভবনে,
ডাকিছেন সবে, সুমধুর রবে,
ভাই সম্বোধন করি ;
সুরপুরে আজ মহামহোৎসব,
হাসে মৃদু মৃদু আর্য্য ঋষি সব,
করে ভক্তগণ, হরিসঙ্কীর্ত্তন,
আনন্দে বদন ভরি।

(২)

স্নান করি স্বর্গমন্দাকিনীনীরে,
পুণ্যের মুকুট পর ভাই শিরে,
দিব্য দেহ ধরি, বসো আলো করি,
গোলোকপতির পাশে ;
বল এ দেশের মঙ্গল বারতা,
অভিনব যোগবিধানের কথা,

দেখ সেথা নব বিধান গৌরব,
সদাকাল মহোল্লাসে।
(৩)
তোমার বিরহে কাঁদিতে কাঁদিতে
কোথা গেলে তাই ভাবিতে ভাবিতে
ভাসি শোকজলে আইনু সকলে
পরলোক সন্নিধানে ;
মৃত্যু নয় তব নূতন জীবন,
কেন আর বৃথা করি হে রোদন,
এস ভাই তবে, এক সঙ্গে সবে,
মিশে থাকি প্রাণে প্রাণে।
(৪)
সম্মুখ সমরে দেহ পরিহরি
যোগবলে রিপু বিদলিত করি
অমর জীবন পাইয়া এখন
থাক সদা চিদাবাসে ;
ধন্য ! ধন্য ! সাধু ! সাধু ! সবে বলে,
মানব মানবী দেবতা সকলে ;
প্রেমেতে বিভোর, হইয়া অঘোর,
জননীর কোলে হাসে।
(৫)
ভক্তবংশ তুমি বীরের সন্তান,
বিজিতাত্মা মহাবীর বলবান,

সার্থক জীবন, সার্থক মরণ,
বিধাতার প্রিয় দাস ;
আর্য্যমুখ তুমি করিলে উজ্জ্বল
প্রকাশিয়া যোগ সাধনের বল,
যোগী ঋষি শান্ত দেবতা মহান্ত
বাঞ্ছে তব সহবাস।

(৬)

পরলোকবাসী নরনারীসনে
কর ধর্ম্মালাপ এবে প্রীত মনে,
প্রচার সেখানে, নূতন বিধানে
মহাযোগসমন্বয় ;
লয়ে যত ভক্ত বিশ্বাসী বান্ধবে
থাক সুখে নিত্যকাল মহোৎসবে,
ভুলি তব শোক, দেখি পরলোক,
যোগে হই মোরা লয়।

(৭)

শুনি অঘোরের স্বর্গারোহণ,
দিব্যলোকবাসী পিতা রামমোহন,
আরো বহু শত, যোগী ঋষি যত,
আগুসারি দেখা দিলা ;
কেহ আলিঙ্গন দেয় প্রেম ভরে,
পসারি দুবাহু স্নেহ সমাদরে,

কেহ চাপি ধরে, বক্ষের উপরে,
কেহ পদে প্রণমিলা।

(৮)

দলে দলে দেব অমর সকলে
ঘন ঘন নাদে হরি হরি বলে,
ধরি তার গলে, মহা কুতুহলে
যায় প্রভু বিদ্যমানে ;
দেয় হুলাহুলি দেব কন্যাগণ,
কেহ করে প্রেমপুষ্প বরষণ,
আনন্দ উল্লাসে, সুরপুর ভাসে,—
মত্ত হয়ে প্রেমগানে।

(৯)

আপন আলয়ে পেয়ে প্রিয় দাসে
বসালেন হরি তারে নিজ পাশে,
আনন্দ বদনে মধুর বচনে
করিলেন আশীর্ব্বাদ ;
বলিলেন, মহাযোগে চির দিন
থাক পুত্র তুমি আমাতে বিলীন
অমর আলয়ে, দেবগণে লয়ে,
পূরাও মনের সাধ।

[সম্পূর্ণ।]

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকারের রচিত নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল মজুমদার কোম্পানি, সংস্কৃত ও সোমপ্রকাশ ডিপজিটারি, পিপল্‌স ও ক্যানিং লাইব্রেরী ওল্ড চায়না বাজার শ্রীপদ্মনাথ মণ্ডল এবং অন্যান্য দোকানে তত্ত্ব করিলে পাওয়া যায়।

পুস্তক		মূল্য মাসল	মূল
বাল্যসখা ১ম ভাগ	... ...	৵০	৵০
ঐ ২য় ভাগ	... ...	।০	।০
ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা	... ...	১॥৵০	১৲
ঈশাচরিতামৃত	... ...	১॥০	১৲
বিধান ভারত দুই খণ্ড (পদ্য)	...	১৲	১৲
বনমালা (পদ্য)	... ...	।০	।০
জগতের বাল্য-ইতিহাস	... ...	৸০	।৵০
ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত	... ...	১॥০	॥০
গীতরত্নাবলী	... ...	১৲	১৲
কলিসংহার নাটক	... ...	॥০	।০
কেশবচরিত...	... ...	১৲	১৲

এতদ্ব্যতীত কেশবচরিত এবং গীতরত্নাবলী এই প্রকারের বাঁধান আছে, দাম ১৵০ এবং ১।০।